ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসঃ
প্রক্রিয়া, কারণ ও উত্তরণের উপায়

৫ আগস্ট ২০১৫

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসঃ প্রক্রিয়া, কারণ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

প্রতিবেদন পর্যালোচনা
শাহজাদা এম আকরাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
নিহার রঞ্জন রায়, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নীনা শামসুন নাহার, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
রুমানা শারমিন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, রবিউল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী হোসেন, জাফর সাদেক চৌধুরী, মাহমুদ হাসান তালুকদারের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়া সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের হাসান আলী, সাভার সনাকের এরিয়া ম্যানেজার, এবং রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের মোরশেদা আক্তার গবেষণায় বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন। গবেষক দল তাদের সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদানের জন্য রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ইমেইলঃ info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইটঃ www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	৫
অধ্যায় এক	৬
ভূমিকা	৬
১.১ প্রেক্ষাপট	৬
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা	৭
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি	৮
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি	৮
১.৫ গবেষণার সময়	৮
১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো	৮
অধ্যায় দুই	৯
পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্ন প্রণয়ন প্রক্রিয়া	৯
২.১ শিক্ষা ব্যবস্থার স্তর, কাঠামো	৯
২.২ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও পাবলিক পরীক্ষা কাঠামোর পরিবর্তন	৯
২.৩ প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণ প্রক্রিয়া	১০
২.৪ উপসংহার	১২
অধ্যায় তিন	১৩
প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া	১৩
৩.১ প্রশ্ন ফাঁস সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য	১৩
৩.২ ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর সম্ভাব্য প্রক্রিয়া	১৪
৩.৩ প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়ায় জড়িত সম্ভাব্য অংশীজন	১৫
৩.৪ প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি: সরকারি অংশীজনের ভূমিকা	১৫
৩.৫ প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি: বেসরকারি অংশীজনের ভূমিকা	১৮
৩.৬ প্রশ্ন বিনিময়ের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের ধরন	২০
৩.৭ প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনি কাঠামো ও এর সীমাবদ্ধতা	২১
৩.৮ প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ	২৩
৩.৯ উপসংহার	২৬
অধ্যায় চার	২৭
প্রশ্ন ফাঁসের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ	২৭
৪.১ প্রশ্ন ফাঁসের কারণ বিশ্লেষণ	২৭
৪.২ প্রশ্ন ফাঁসের ফলাফল	২৯
৪.৩ প্রশ্ন ফাঁসের প্রভাব	৩০
৪.৪ উপসংহার	৩১
অধ্যায় পাঁচ	৩২
উপসংহার ও সুপারিশ	৩২
৫.১ সুপারিশ	৩২
তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থাবলী	৩৩
পরিশিষ্ট	৩৪

সারণির তালিকা

সারণি **১.১**: প্রাথমিক তথ্যের উৎস ৮

চিত্রের তালিকা

চিত্র **১**: বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ (২০১২-২০১৫) ১৩

চিত্র ২: প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়ায় জড়িত সম্ভাব্য অংশীজন ১৪
চিত্র ৩: প্রশ্ন প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণে সম্ভাব্য ঝুঁকি: *পিইসিই* ১৫
চিত্র ৪: প্রশ্ন প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণে সম্ভাব্য ঝুঁকি: জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা ১৬
চিত্র ৫: প্রশ্ন ছাপানোর পর্যায়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি: পিইসিই, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা ১৬
চিত্র ৬: প্রশ্ন বিতরণ পর্যায়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি: পিইসিই, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা ১৭
চিত্র ৭: প্রশ্ন ফাঁস ও বাজারজাতকরণের সিন্ডিকেট ১৯
চিত্র ৮: প্রশ্ন ফাঁসে অর্থের সংশ্লিষ্টতা ২১
চিত্র ৯: প্রশ্ন ফাঁসের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ ৩১

বক্সের তালিকা

বক্স ১: মোবাইলে ও ফেসবুকে প্রশ্ন ফাঁস ১৩
বক্স ২: প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা- যে পরীক্ষা স্থগিত করা হয় ২৫
বক্স ৩: নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের অস্বীকারের প্রবণতা ২৭
বক্স ৪: শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উদ্বেগ ২৭

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করে চলেছে। এরই অংশ হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বর্তমান সরকার দক্ষ ও উন্নত মানবসম্পদ গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বাংলাদেশকে সফল মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিজিটাইজেশন, বছরের প্রথম দিনে নতুন বই বিতরণ নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং শিক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্ধন যেমন প্রাথমিকে পিইসিই, মাধ্যমিকে জেএসসি, গ্রেডিং সিস্টেম ও সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন ইত্যাদি।

তবে এসব ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু কিছু সুশাসনের ঘাটতি বিদ্যমান, যার মধ্যে পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের প্রবণতা অন্যতম। বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনে শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে। তবে প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপকতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেখানে পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

টিআইবি'র গবেষক নিহার রঞ্জন রায়, নীনা শামসুন নাহার ও রুমানা শারমিন এ গবেষণাটি পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন। এছাড়াও টিআইবি'র গবেষণা বিভাগের পরিচালকসহ অন্যান্য সহকর্মী মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

গবেষণা সম্পাদনে টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়ের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা আশা করি এই প্রতিবেদনের উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণ পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের সমস্যা ও অনিয়ম সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম হবে এবং বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দিক-নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে যেকোনো পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

ভূমিকা

১.২ প্রেক্ষাপট

শিক্ষা হচ্ছে পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞানলাভের একটি প্রক্রিয়া যা প্রকৃতপক্ষে সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অব্যাহত অনুশীলন। বিশ্বের যেকোনো দেশের মতই বাংলাদেশেও শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা[১] এবং অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাদিত নাগরিক সৃষ্টি ও নিরক্ষতা দূর করার জন্য আইনের দ্বারা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[২] শিক্ষাখাতে সরকারের বর্তমান অগ্রাধিকার হচ্ছে বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্তকরণের নিম্নহার কাটানো, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে ধনী ও গরীবের মধ্যেকার পার্থক্য কমানো, দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত ও গুণগত লক্ষ্য নির্ধারণ-বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ও বিদ্যালয় সমাপ্তকরণের হার বাড়ানো এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করা (ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫),[৩] দক্ষ ও নৈতিকভাবে শক্তিশালী মানসম্মত উন্নয়নের জন্য সকল পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা (জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০১০-২০২১),[৪] এবং সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র)[৫]। শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যতম মূল লক্ষ্যগুলো হল সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, ধনী ও গরীবের মধ্যে শিক্ষার পার্থক্য দূরীকরণ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ একটি নতুন প্রজন্ম তৈরি করা, এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষার গুণগতমান ও সমতা বাড়ানো (রূপকল্প ২০২১)।[৬] আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) অন্যতম লক্ষ্য অনুয়ায়ী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে সকল শিশুর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।[৭]

শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার যেসব নীতিনির্ধারণী পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলোর মধ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' অন্যতম।[৮] এই নীতিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার মানোন্নয়নকে সর্বাধুনিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে।[৯] ২০১০ সালে খসড়া 'শিক্ষা আইন ২০১৪' প্রণীত হলেও তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে খসড়া আইনে প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বাণিজ্যে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে গাইডবই, নোটবই তৈরি এবং সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।[১০] ইতোমধ্যে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। উক্ত শিক্ষাক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে উল্লিখিত স্তরের পাঠ্যপুস্তক। দেশব্যাপী প্রাথমিক, এবতেদায়ি, মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের মতো কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি প্রদান, স্কুল-কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও অনলাইনে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রদানে কাজ করে চলেছে। তাছাড়াও বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালু এবং শিক্ষকের জন্য নতুন পদ সৃষ্টিসহ যথাসময়ে নিয়োগদানের

---

[১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (পঞ্চদশ সংশোধনী), অনুচ্ছেদ ১৫ (ক)।

[২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (পঞ্চদশ সংশোধনী), অনুচ্ছেদ ১৭।

[৩] পরিকল্পনা কমিশন, *ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)*, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১২।

[৪] পরিকল্পনা কমিশন, *জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১)*, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মে ২০১৩, পৃ ৬২।

[৫] মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, *সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*, সুপারিশ নং ২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১২।

[৬] Planning Commission, *Perspective Plan of Bangladesh (2010-2021): Making Vision 2021 A Reality*, General Economics Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, April 2012.

[৭] United Nations, *The Millenium Development Goals Report (2015)*, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/UNDP_MDG_Report_2015.pdf .

[৮] জাতীয় সংসদে ২০১০ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়। দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সার্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে এমন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে এ শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়। তাছাড়া, শিক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীল চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়া ও শিক্ষার মান অর্জনের জন্য গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট, টিউশনি ও কোচিং বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এসবের অপকারিতা বিষয়ে সচেতন করার কথাও বলা আছে এ নীতিতে। উৎস: আক্তারুজ্জামান, ম., ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১২, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০: প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা*, অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য, বিস্তারিত জানতে দেখুন, http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/6225 (সংগ্রহের তারিখ: জুন ১৪, ২০১৫)।

[৯] নির্বাচনী ইশ্তেহার (২০১৪), বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, প্যারা ৯.৩।

[১০] *শিক্ষা আইন কবে*, দৈনিক সমকাল, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।[১১] বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকার প্রতি অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ১০ শতাংশেরও অধিক বরাদ্দ রাখছে।[১২] এসব উদ্যোগ গ্রহণের ফলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার সমতা অর্জন, উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার সমন্বিত মানোন্নয়নের প্রয়াসের সাথে যুক্ত হওয়া ডিজিটাল ক্লাসরুম ও ডিজিটাল কনটেন্ট প্রভৃতি শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনে সহায়ক হয়েছে।[১৩] সার্বিকভাবে শিক্ষার প্রতি দেশের সকল স্তরের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

তবে সরকারের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও গৃহীত পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন দৃশ্যমান হলেও শিক্ষা খাতে অর্জন নিয়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ফেল না করানো বা পাশের হার বাড়ানোর বিষয়ে সরকারের নীতিগত অবস্থান/ সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা রয়েছে যেখানে সরকারকে পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধির জন্য গুণগত মানের পরিবর্তে পরিমাণগত মানের দিকে অধিক মনোযোগী হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখা যায়।[১৪] বর্তমান পরীক্ষা কাঠামো অনুযায়ী পাবলিক পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক চাপ বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি পরীক্ষা সংক্রান্ত সনাতনী ধ্যান-ধারণারও পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাচ্ছে যেখানে মেধা যাচাই, প্রতিযোগিতা, মূল্যায়ন প্রভৃতির স্থলে সবাই যাতে পাশ করে এ ধরনের প্রণোদনা দিতে দেখা গেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থানগত উন্নতি দেখানোর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে যেকোনো উপায়ে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।[১৫] অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যেও একই উপায়ে পরীক্ষায় পাশ করা ও ভালো ফলাফল করার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে।[১৬] আবার সরকারের লিখিত নথি ছাড়াও পাশের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের মত বিষয়টি ক্ষেত্রবিশেষে 'সহজতর ইনসেনটিভ' বা 'সিস্টেম' হিসেবে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।[১৭] পাশাপাশি বিশ্লেষকদের মতেও প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, এটি সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

প্রতিটি শিক্ষাস্তরের শেষে মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং পরবর্তী স্তরে প্রবেশের জন্য শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাই করার ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ যেসকল পরীক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলো হল প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষার গুণগত মান কমে যাচ্ছে, শিক্ষার্থীর যথাযথ মূল্যায়ন ব্যাহত হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে প্রশ্ন ফাঁসের ভূমিকা অন্যতম এমন অভিযোগ উঠতে দেখা গেছে।[১৮] প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে গণমাধ্যমে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও তা নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের গুরুত্ব না দেওয়া ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বরং এটি মিডিয়ার সৃষ্টি বলে দাবি করা হয়।[১৯] এমনকি তদারকি ও পদক্ষেপ নেওয়ার চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্ন ফাঁসের দোষ চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায় এবং প্রশ্ন ফাঁস বন্ধে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ রাখারও তাৎক্ষণিক ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে বহুল আলোচিত হলেও এবং এ সংক্রান্ত অনেক প্রবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশিত হলেও কিভাবে ও কোন পর্যায়ে প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে, কোন কোন পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়, এ প্রক্রিয়ায় কারা জড়িত, সরকারের পক্ষ থেকে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে।

---

[১১] শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৩, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

[১২] শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন বাজেটে গত পাঁচ বছরে বরাদ্দ ছিল ২০১৫-২০১৬ সালে ১২.৩% (http://www.mof.gov.bd/en/budget/15_16/brief/en/chart-5.pdf); ২০১৪-১৫ সালে ১৫.৪% (http://www.mof.gov.bd/en/budget/14_15/brief/en/chart5.pdf); ২০১৩-১৪ সালে ১৩.৫% (http://www.mof.gov.bd/en/budget/13_14/brief/en/chart5.pdf); ২০১২-১৩ সালে ১৩.১% (http://www.mof.gov.bd/en/budget/12_13/brief/en/chart5.pdf); এবং ২০১১-১২ সালে ১২.৪% (http://www.mof.gov.bd/en/budget/11_12/brief/en/chart5.pdf).

[১৩] শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৩, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

[১৪] ৭০% ক্লাসে উপস্থিত ছিল এমন শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পরিপত্র জারি; বাংলাদেশ সচিবালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১ মার্চ, ২০১৫, পরিপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা; মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৫ ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৫, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ২০১৪; শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

[১৫] 'প্রশ্নপত্রের কাঠামো পাল্টাচ্ছে', *দৈনিক যুগান্তর*, ১১ মে ২০১৫।

[১৬] মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, শিক্ষাবিদ, ২৩ মার্চ ২০১৫।

[১৭] মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা- শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ফোরামের প্রতিনিধি ও অন্যান্য মাধ্যমিক উৎস।

[১৮] মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, শিক্ষাবিদ, ২৩ মার্চ ২০১৫।

[১৯] একাধিক মাধ্যমিক সূত্র হতে সংগৃহীত। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'বিগত পাঁচ বছরে কোনো প্রশ্ন ফাঁস হয়নি, এ বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া যাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয় এবং প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় ইংরেজি ২য় পত্রের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে' (সূত্র: 'সংসদে শিক্ষামন্ত্রী, গত পাঁচ বছরে প্রশ্ন ফাঁস হয়নি: শিক্ষামন্ত্রী', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ জুন ২০১৪)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। টিআইবি যে পাঁচটি খাতকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে শিক্ষা খাত তার মধ্যে অন্যতম। টিআইবি যে পাঁচটি সেবা খাতকে প্রাধান্য দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে শিক্ষা তার মধ্যে অন্যতম; এরই ধারাবাহিকতায় প্রশ্ন ফাঁসের পেছনে সুশাসনের ঘাটতিজনিত কারণ অনুসন্ধানে এই গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার উদ্দেশ্য প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া ও কারণ চিহ্নিত করা এবং উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা।

শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের ভিত্তিস্বরূপ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসিই), জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি ও এইচএসসি) পরীক্ষাগুলো গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এখানে পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন, ছাপানো, পরিবহন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি; প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া ও কারণ; প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা হয়েছে ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝুঁকির ওপর আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ গবেষণায় প্রাপ্ত অভিযোগগুলো সকল অংশীজন বা কর্তৃপক্ষের সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে প্রশ্ন ফাঁসের সম্ভাব্য প্রক্রিয়া ও বিতরণের ক্ষেত্রে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের গুণগত তথ্য সংগ্রহ কৌশল যেমন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ও একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস ও টুল: গবেষণায় প্রাথমিক ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎসের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে মোট ৬২ জনের কাছ থেকে এবং দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মতামত দেন মোট ৩২ জন তথ্য প্রদানকারী। তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন, সরকারি প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশনা, সরকারি প্রতিবেদন, তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ, প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ (সারণি ১.১ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ১.১: প্রাথমিক তথ্যের উৎস

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের টুল	তথ্যের উৎস	সংখ্যা
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	চেকলিস্ট	শিক্ষাবোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা; বিজি প্রেসের কর্মকর্তা- কর্মচারী; শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা; প্রশ্ন প্রণেতা; তদন্ত কমিটির সদস্য; শিক্ষাবিদ; সাংবাদিক; কোচিং সেন্টারের মালিক; ফটোকপির দোকানের কর্মকর্তা; অভিভাবক ও শিক্ষার্থী ও অভিভাবক ফোরামের প্রতিনিধি	৬২ জন
দলীয় আলোচনা	চেকলিস্ট	শিক্ষার্থী (একটি), শিক্ষক (ঢাকা ও ঢাকার বাইরে মোট ২টি), ঢাকা শিক্ষাবোর্ড (একটি)	৩২ জন

১.৫ গবেষণার সময়

২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে জুলাই পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনে মোট পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশ্ন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, এবং বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া এবং চতুর্থ অধ্যায়ে প্রশ্ন ফাঁসের কারণ, ফলাফল ও প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে, পঞ্চম অধ্যায়ে প্রশ্ন ফাঁস রোধে সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্ন প্রণয়ন প্রক্রিয়া

এই অধ্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার স্তর, কাঠামো এবং শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য আলোচনার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার সমসাময়িক পরিবর্তন, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন, প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন, ছাপানো ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ শিক্ষা ব্যবস্থার স্তর ও কাঠামো

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তিনটি মূল স্তর রয়েছে: প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (এমওপিএমই) এবং প্রাথমিক পরবর্তী ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় (এমওই)। তবে দু'টি মন্ত্রণালয় মূল দায়িত্বে থাকলেও বিভিন্ন বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট) ও অধিদপ্তরের (ডিরেক্টরেট) সহযোগিতায় শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়।[২০] মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ১০টি শিক্ষাবোর্ড রয়েছে: ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বোর্ড।[২১]

২.২ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও পাবলিক পরীক্ষা কাঠামোর পরিবর্তন

পাবলিক পরীক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশে চালু হয়েছিল ব্রিটিশদের উদ্যোগে। প্রবর্তিত রীতি অনুসারে ১০ বছরের বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম শেষ করার পর প্রথম পাবলিক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হতো শিক্ষার্থীদের। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিগত ১৫ বছরে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ:

- **পিইসিই ও জেএসসি পরীক্ষার প্রবর্তন**

২০০৯ সাল থেকে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসিই) নামে একটি নতুন পাবলিক পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে চালু হয়েছে আট বছরের নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা শেষে অনুষ্ঠেয় জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা বা জেএসসি।

- **লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন**

২০০১ সালের আগ পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফলাফল প্রকাশ করা হত। ২০০৩ সাল থেকে এইচএসসি, ২০০১ সাল থেকে এসএসসি, এবং প্রবর্তনের বছর থেকেই অর্থাৎ ২০০৯ সালে পিইসিই ও ২০১০ সালে জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হচ্ছে। লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণের কোনো বিভাগ থাকে না। শিক্ষা বোর্ড থেকে ইস্যুকৃত মূল সনদে বিভাগের স্থলে Grade Point Average (GPA) উল্লেখ থাকে। এছাড়া নিয়মানুযায়ী নম্বরপত্রের পরিবর্তে মূল্যায়নপত্র (একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট) ইস্যু করা হয়। এতে প্রত্যেক বিষয়ের প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট (Grade Point) ও জিপিএ এবং প্রতি গ্রেডের জন্য নির্ধারিত শ্রেণি ব্যাপ্তি উল্লেখ থাকে।

- **সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তন**

বর্তমানে প্রশ্নপত্রের দুই ভাগে একটি পরীক্ষা হয়। প্রথম অংশে সৃজনশীলে ৬০ ও দ্বিতীয় অংশে বহুনির্বাচনীতে ৪০ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তিন ঘন্টায়।[২২] বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্বমানের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে ২০১০ সাল থেকে সৃজনশীল শিক্ষা

---

[২০] জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম বোর্ড (এনসিটিবি), বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্ট্যাটিসটিকস (বেনবেইস), পরিদর্শন ও নীরিক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বেসরকারি শিক্ষক রেজিস্ট্রেশন এন্ড সার্টিফিকেট কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

[২১] http://www.educationboard.gov.bd/computer/, (সংগ্রহের তারিখ: ৪ জুন ২০১৫)।

[২২] এ পদ্ধতিতে প্রথম অংশে নয়টি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মধ্যে ৬টি ও দ্বিতীয় অংশে ৪০ নম্বরের জন্য ৪০টি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। প্রথম অংশের (জ্ঞানমূলক) জন্য প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য একটি দৃশ্যকল্প (প্যারাগ্রাফ বা চিত্র বা ছক) দেওয়া হয় এবং এর ওপর সহজ থেকে ক্রমান্বয়ে কঠিনের দিকে ১০ নম্বরের ৪টি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন করা হয়। এরপর শিক্ষার্থী বিষয়টি সম্পর্কে কতটুকু বুঝতে পারল তা যাচাই করার জন্য একটি সহজ প্রশ্ন করা হয় (অনুধাবনমূলক)। বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থী যা জানল তা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজে লাগাবে বা অপরিচিত কোন ক্ষেত্রে লব্ধ জ্ঞানটি কীভাবে প্রয়োগ করবে তা জানতে চাওয়া হয় (প্রয়োগ)। সবশেষে বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর কিছু বিশ্লেষণধর্মী মতামত ও মূল্যায়ন বা একটি সমাধান চাওয়া হয় (উচ্চতর দক্ষতা)। উৎস: http://www.srijonshil.com/, (সংগ্রহের তারিখ: ৪ জুন ২০১৫); 'সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাবে', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০ জানুয়ারি ২০১০; *পাবলিক পরীক্ষা ও 'মাকাল ফল'*, ২৮ নভেম্বর ২০১৪, আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন, http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/22674 (সংগ্রহের তারিখ: ১৪ জুন ২০১৫)।

পদ্ধতির আওতায় দেশে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে চিন্তাশক্তির প্রয়োগে এবং সমস্যা সমাধানে পারদর্শী ও সামগ্রিকভাবে সৃজনশীল করে গড়ে তোলার জন্যই এ পদ্ধতি। গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সীমিত প্রশ্ন মুখস্ত করত। ফলে পাঠ্যবইয়ের বিরাট অংশ তাদের জ্ঞানের বাইরে থেকে যেতো। কিন্তু সৃজনশীল পদ্ধতিতে গোটা পাঠ্য বইয়ের সবখান থেকে প্রশ্ন করার নিয়ম রয়েছে। মূল কথা হল, এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিন্যস্ত মৌলিক উদ্দীপকের সাহায্যে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা হয়। এ পদ্ধতিতে মৌলিক প্রশ্ন হওয়ায় এবং একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি না হওয়ার নিশ্চয়তা থাকায় নোটবই বা গাইডবই কোনভাবেই শিক্ষার্থীকে সমাধান দিতে সহায়ক নয় বরং শিক্ষার্থী নিজেই নিজের সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে বাধ্য থাকে।[২৩]

২.৩ প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণ প্রক্রিয়া

পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণ প্রক্রিয়াকে সার্বিকভাবে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, ১. প্রশ্ন প্রণয়ন (যার মধ্যে রয়েছে খসড়া প্রশ্ন তৈরি, প্রশ্ন মডারেশন, প্রশ্ন চূড়ান্ত করা), ২. প্রশ্ন ছাপানো, ও ৩. প্রশ্ন বিতরণ। প্রশ্ন প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু করা হয় পরীক্ষা শুরুর কয়েক মাস আগে। প্রশ্ন প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ[২৪]) এবং অন্য পরীক্ষাগুলোর জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। প্রতিটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রেখে প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণ করা হয়।

পিইসিই পরীক্ষা: প্রতিবছর নভেম্বরের শেষের দিকে পিইসিই পরীক্ষা আরম্ভ হয়। এজন্য প্রশ্ন প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু হয় এর কয়েকমাস আগে থেকে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেপ) তত্ত্বাবধানে পিইসিই পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়। প্রথমে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের তালিকা সংগ্রহ করা হয় ও বাছাইকৃত শিক্ষকদের নিয়ে একটি প্যানেল করা হয়। একাডেমিতে থেকেই শিক্ষকরা পিইসিই পরীক্ষার জন্য একসেট প্রশ্ন তৈরি করেন। তাদেরকে একাডেমিতেই রাখা হয় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে যেকোনো ধরনের জনসম্পৃক্ততা থেকে বিরত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। প্রণীত প্রশ্ন পাঠানো হয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের কাছে। উক্ত প্যানেল প্রশ্ন যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত করে। এ পর্যায়ে অধিদপ্তর থেকে ছাপানোর জন্য পাঠানো হয় বিজি প্রেসে।[২৫] ছাপানোর পর বিজি প্রেস থেকে চাহিদানুযায়ী প্যাকেটজাত, সিলগালা ও ট্রাংকজাতকরণের পর পাঠিয়ে দেওয়া হয় অধিদপ্তরে।[২৬] পরবর্তী ধাপগুলো জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণের মত একইভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে যা পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে।

২.৩.১ প্রশ্ন প্রণয়ন: শিক্ষা বোর্ডের ভূমিকা

ক. প্রশ্ন প্রণয়নকারী নিয়োগ ও প্রাথমিক প্রশ্ন প্রণয়ন প্রক্রিয়া

প্রাথমিক পরবর্তী পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য একটি আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আন্তঃ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট বোর্ডের নির্দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশ্নকর্তা নিয়োগ করার জন্য শিক্ষক বাছাই করার মধ্য দিয়ে

---

[২৩] ২০১২ সালে পিইসিই পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এই পরীক্ষায় প্রথমবারের মতো ১০ শতাংশ সৃজনশীল প্রশ্ন চালু করা হয়, ২০১৩ সালে সৃজনশীল প্রশ্ন বাড়িয়ে করা হয় ২৫ শতাংশ, ২০১৪ সালে করা হয় ৩৫ শতাংশ। পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সাল থেকে শতভাগ প্রশ্নই যোগ্যতাভিত্তিক করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে ইতমধ্যে ২০১৫ সালের পিইসিই পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশ ৫০ শতাংশে উন্নীত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ২০১৪ সালে জেএসসিতে গণিত পরীক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীল পদ্ধতির পরীক্ষা শুরু হয়। উল্লেখ্য এর আগে কোন পাবলিক পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতিতে গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০১০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় প্রথমবারের মত বাংলা ও ধর্ম বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হয়। ২০১১ সালে বাংলা ও ধর্মের সাথে যুক্ত হয় বিজ্ঞান, সাধারন বিজ্ঞান, ভূগোল রসায়ন ও ব্যবসায় পরিচিত বিষয়ে। ২০১৫ সালে গণিতেও সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়। এরপর ২০১২ সালে এসসএসসির পাশাপাশি এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বাংলায় সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন চালু হয়। ২০১৩ সালে বাংলার সাথে যুক্ত হয় রসায়ন, পৌরনীতি, ব্যবসায়ে নীতি। ২০১৪ সালে এইচএসসিতে পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজকল্যাণ, সমাজবিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবসায়ে উদ্যোগ ও প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনায় এই প্রশ্ন পদ্ধতি প্রয়োগ হয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, http://bn.banglapedia.org/index.php?, (সংগ্রহের তারিখ: ৫ মে, ২০১৫)ও 'প্রশ্নফাঁস রোধ অসম্ভব নয়', *দৈনিক যুগান্তর*, ১৬ জুন ২০১৪; 'সৃজনশীল প্রশ্ন বাড়ছে', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ মার্চ ২০১৫; 'এ সৃজনশীল পদ্ধতির অর্থ কী', *দৈনিক যুগান্তর*, ৭ এপ্রিল ২০১৫। http://www.nape.gov.bd/images/PDF/pecestruc15.pdf (সংগ্রহের তারিখ: ৪ জুন ২০১৫)।

[২৪] বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সুপারভিশন এবং মনিটরিং এর জন্য এপেক্স প্রতিষ্ঠান। ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে নেপ একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে, http://nape.mymensingh.gov.bd/

[২৫] এ পর্যায়ে বিজি প্রেসের বিস্তারিত ভূমিকা দেখতে দেখুন প্রতিবেদনের ২.৩.২ অংশটি।

[২৬] সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার, ১৪ জুন ২০১৫।

শুরু হয় প্রশ্ন প্রণয়নের প্রাথমিক কার্যক্রম। সৎ, ভাল, গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারবে এমন শিক্ষকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় প্রশ্ন প্রণয়ন ও মডারেশনের জন্য।[২৭] নিয়মানুযায়ী এক শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্ন প্রণয়ন করেন অন্য বোর্ডের শিক্ষকরা। কাজেই বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অন্য বোর্ডের অধিভুক্ত স্কুল ও কলেজ থেকে দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তালিকা চান। প্রশ্নকর্তা নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের বাইরে থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। আবেদনকারীর বিষয়ে প্রয়োজনীয় খোঁজ খবর নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পর তাদের মধ্য থেকে বিষয়পত্র অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি পত্রের জন্য চারজন শিক্ষককে প্রশ্ন প্রণেতা হিসেবে নির্বাচন করেন নিজ নিজ বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। আটটি বোর্ডের প্রতিটি পত্রের জন্য চারটি করে মোট ৩২ সেট প্রশ্ন তৈরি করা হয়। কোনটি কোন বোর্ডের প্রশ্ন তা কেউ জানে না। প্রশ্নকর্তাকে সিলেবাস এবং আগের বছরের প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়। সিলেবাসের আলোকেই প্রশ্ন তৈরি করেন তারা। প্রশ্নকর্তা নিজে প্রশ্ন তৈরি করেন, নিজেই প্যাকিং করেন এবং সিলগালা করেন। এখানে বোর্ড শুধু লজিস্টিক সহযোগিতা দেয়। প্রশ্ন সিলগালা করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বোর্ডে। এরপর বোর্ড দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করে।

খ. প্রশ্ন মডারেশনকারী নিয়োগ ও মডারেশন প্রক্রিয়া

প্রশ্ন মডারেশন করার জন্য প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি পত্রের ক্ষেত্রে চারজন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন মডারেশনের কাজ করেন অন্য বোর্ডের শিক্ষকরা। নির্ধারিত দিনে মডারেটররা শিক্ষা বোর্ড অফিসে হাজির হন। তাদের হাতে সিলগালা করা প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। মডারেটর নির্ধারিত কক্ষে বসে সিলগালা তুলে মডারেশনের কাজ শুরু করেন। এ পর্যায়ে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, যেমনঃ নির্ধারিত কক্ষে প্রবেশের সময় মোবাইল ফোন, খাতা, কলম, পেনসিল, বই, রেকর্ডার বা এ ধরনের কোনো কিছু নিয়ে প্রবেশ না করা; কক্ষে প্রবেশের পর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বের না হওয়া ইত্যাদি। মডারেটরদের খাবারসহ প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ সরবরাহ করে বোর্ড। প্রশ্নপত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন, বিয়োজন, পরিবর্তন করতে পারেন মডারেটররা - প্রয়োজনে এমনকি পুরো প্রশ্নই বদলে ফেলতে পারেন। মডারেটররা আলাদা আলাদাভাবে চার সেট প্রশ্ন চূড়ান্ত করার পর সিলগালা অবস্থায় প্রশ্ন পাঠিয়ে দেন আন্তঃ শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়।

গ. প্রশ্ন নির্বাচন প্রক্রিয়া

এই পর্যায়ে আন্তঃ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অন্যান্য বোর্ডের চেয়ারম্যানদের ডাকেন। লটারির মাধ্যমে এক বোর্ডের চেয়ারম্যান অন্য বোর্ডের প্রশ্ন নির্বাচন করেন। সিলগালা অবস্থায় চারটি সেট থেকে লটারিতে নির্বাচন করা হয় দুটি সেট। তবে কোন সেটে কোন প্রশ্ন আছে বা কোন বোর্ডে বিতরণ করা হবে তা কারো জানা থাকে না। দু'টি সেট বোর্ডে সংরক্ষণ করা হয় ও নির্বাচিত দু'টি সেট বিজি প্রেসে প্রেরণের মাধ্যমে শুরু হয় প্রশ্ন ছাপানো প্রক্রিয়া।

২.৩.২ প্রশ্ন ছাপানোঃ বিজি প্রেসের ভূমিকা

নির্বাচিত দুটি সেট প্রশ্ন সিলগালা অবস্থায়ই ছাপার জন্য পাঠানো হয় বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়ে (বিজি প্রেস)। উল্লেখ্য, কোন কেন্দ্রে কত প্রশ্ন লাগবে তার একটি তালিকা বোর্ড বিজি প্রেসকে সরবরাহ করে। ছাপানোর জন্য হাতে লেখা প্রশ্নটি কম্পোজের জন্য কম্পোজারের কাছে পাঠানো হয়। কম্পোজার হাতে লেখা প্রশ্নের কোনো অংশ বুঝতে না পারলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মডারেটরের কাছে জানতে চাইতে পারেন। কম্পোজ হয়ে গেলে প্রুফ দেখার জন্য প্রুফ রিডারের কাছে পাঠানো হয়। প্রুফ দেখা শেষ হলে মুদ্রণের জন্য প্রশ্ন ডিজাইনসহ অন্যান্য কাজ (ট্রেসিং সেন্টারে প্রেরণ, পেস্টিং ইত্যাদি) সম্পন্ন করা হয়। এভাবে প্রশ্ন ছাপানোর কাজটি সম্পন্ন হয়। এরপর প্যাকেটিং তালিকা অনুযায়ী প্যাকেটজাত করে সিলগালা করা হয়। উল্লিখিত চারটি পরীক্ষার প্রশ্নই এই প্রক্রিয়ায় বিজি প্রেসে ছাপানো ও প্যাকেটজাত করা হয়।

২.৩.৩ প্রশ্ন বিতরণঃ প্রশাসন, কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বোর্ড বা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ছাপানো প্রশ্ন চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন কেন্দ্রের জন্য ট্রাংকজাত করা হয়। চাহিদা অনুযায়ী ছাপিয়ে প্যাকেটজাত করে প্রশ্ন সিলগালা অবস্থায় হস্তান্তর করা হয় জেলা প্রশাসকের কাছে। শহর এলাকায় পরীক্ষার পূর্বে জেলা প্রশাসক অফিসের অধীনে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসক অফিসের ট্রেজারিতে প্রশ্ন গচ্ছিত থাকে। উপজেলা পর্যায়ে ট্রাংকভরা প্রশ্নগুলো একজন ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে পুলিশ কাস্টডিতে গচ্ছিত থাকে। নিরাপত্তা বা ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক লকারেও প্রশ্ন রাখা হয় ।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা হবে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র প্রধানেরা পরীক্ষার ২/৩ দিন পূর্বে ট্রাংক খুলে কেন্দ্র অনুযায়ী প্রতিটি কক্ষের জন্য প্রশ্নপত্রের প্যাকেট চাহিদা অনুযায়ী ঠিক আছে কিনা যাচাই করেন এবং নিজ নিজ কেন্দ্রের জন্য সকল বিষয়ের প্যাকেটজাত প্রশ্নপত্রের সেট আলাদা করে দায়িত্বপ্রাপ্ত

---

[২৭] সাবেক বোর্ড চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার, ২৪ জুন ২০১৫।

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত আকারে প্রতিবেদন পেশ করেন। এরপর ট্রাংক পুনরায় সিলগালা করে দেওয়া হয়। প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে কেন্দ্রের দূরত্ব অনুযায়ী গড়ে ৫০-৬০ মিনিট আগে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে প্রশ্ন বুঝে নেন সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা। উল্লেখ্য প্রশ্ন এমনভাবে শিক্ষকদের কাছে হস্তান্তর করা হয় যেন ন্যূনতম ৩০ মিনিট সময় হাতে থাকে কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য। ম্যাজিস্ট্রেট নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রশ্ন বিতরণের পূর্বে কোন সেটের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে তা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জানিয়ে দেন। এরপর দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রহরায় প্রশ্নপত্রের সেট প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যান।[২৮]

২.৪ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিগত ছয় বছরে শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম বিশেষ করে পরীক্ষা কাঠামো পরিবর্তনে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সৃজনশীল পদ্ধতি, জেএসসি ও পিইসিই পরীক্ষার প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি প্রশ্ন প্রণয়নেও নতুন নতুন কৌশল যুক্ত হতে দেখা যায়, যেমন পিইসিই পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নের দায়িত্বে রয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। এছাড়াও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি অনেক দীর্ঘ। এ প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণ কার্যক্রমটি সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া মূলত ম্যানুয়ালি প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হয় বলে অনেকগুলো অংশীজনের জড়িত থাকার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে।

[২৮] 'যেভাবে তৈরি হয় প্রশ্ন', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৪ জুন ২০১৪; মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, বোর্ড চেয়ারম্যান ও তদন্ত কমিটির প্রধান, ২৪ জুন ২০১৫ ও ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫; সরকারি কলেজের শিক্ষকের সাক্ষাৎকার, ১৭ মে ২০১৫।

প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া ও এ সম্পর্কিত ঝুঁকি, প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত অংশীজন, প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনি কাঠামো এবং প্রশ্ন ফাঁসের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ প্রশ্ন ফাঁস সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য

বাংলাদেশে ১৯৭৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় প্রথমবারের মত প্রশ্ন ফাঁসের তথ্য পাওয়া যায়। তবে গত শতকের সত্তরের দশক থেকে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটলেও তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে গত পাঁচ বছরে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ একটি নিয়মিত ঘটনা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে একই পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁস, প্রশ্ন ফাঁসের প্রেক্ষিতে একটি পরীক্ষা স্থগিত করা, তদন্ত কমিটি গঠন ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রশ্ন ফাঁস রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্তদের উদ্যোগ গ্রহণে আন্তরিকতার ঘাটতির বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

চিত্র ১: বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ (২০১২-২০১৫)

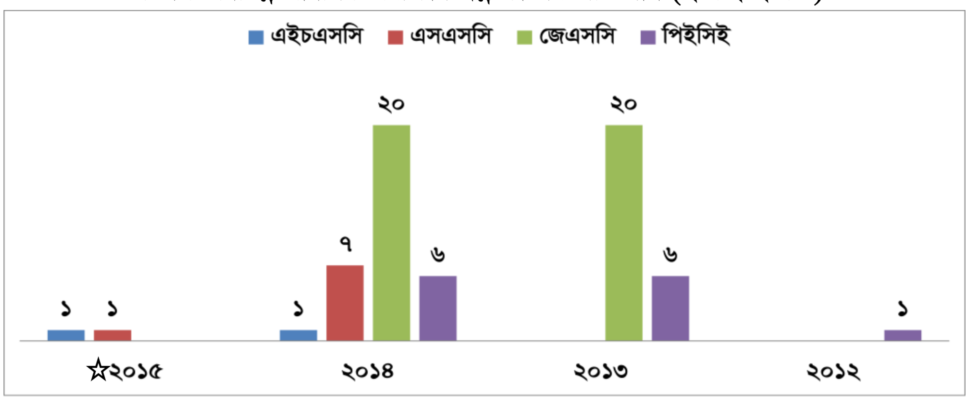

☆২০১৫ সালে জেএসসি ও পিইসিই পরীক্ষা এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি

২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চার বছরে বিভিন্ন বিষয়ের মোট ৬৩টি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ২০১৩ ও ২০১৪ সালের পিইসিই ও জেএসসি পরীক্ষার সবগুলো পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার অভিযোগের তথ্য পাওয়া যায়। তবে ২০১৩ সালের পিইসিই পরীক্ষার দুটি বিষয়ে প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ মিললেও এসব পরীক্ষা বাতিল করা হয় নি (বক্স ১ দ্রষ্টব্য)।[২৯]

বক্স ১: মোবাইলে ও ফেসবুকে প্রশ্ন ফাঁস

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস পঞ্চম শ্রেণির দুইজন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতেন। ঐ বছরের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা শুরুর আগের দিন থেকে ঐ ছাত্ররা তার কাছে পড়তে না আসার কারণ জানতে চাইলে তারা জানায়, উক্ত পরীক্ষার প্রশ্ন তারা পেয়ে গেছে বলে প্রাইভেট পড়ার আর প্রয়োজন নেই। কটিয়াদির একজন ছাত্র মোবাইলে একই বছরের পিইসিই পরীক্ষার 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়টির প্রশ্ন পায় যা পরবর্তীতে পরীক্ষা কেন্দ্রে সরবরাহকৃত প্রশ্নের সাথে মিলে যায়। ভৈরবের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ফেসবুক থেকে পাওয়া একটি মোবাইল নম্বরে প্রশ্নপত্রের বিষয়ে কথা বলে জানতে পারেন, ঐ দিনেই অনুষ্ঠিতব্য 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়টির প্রশ্ন ২০০ টাকার বিনিময়ে পাওয়া যাবে। তার জন্য একটি ফেসবুক আইডি পাঠাতে হবে। উক্ত পরীক্ষার ফাঁসকৃত প্রশ্ন হুবহু মিলে যায় বলে অভিভাবক মহল থেকে সত্যতা পাওয়া যায়।

সূত্র: 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা: ফেসবুক, মোবাইলে ফাঁস প্রশ্ন মিলে যাচ্ছে হুবহু', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২৬ নভেম্বর ২০১৫।

[২৯] কোন কোন পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ রয়েছে তা জানতে দেখুন পরিশিষ্ট ১।

৩.২ ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর সম্ভাব্য প্রক্রিয়া

৩.২.১ ফাঁসকৃত প্রশ্ন পাওয়ার সময়

প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় পরীক্ষার কয়েক দিন আগে থেকে প্রশ্ন পাওয়া যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু প্রশ্ন পাওয়া যায় যেগুলোর সাথে মূল প্রশ্ন আংশিক মিলে যায়, কিছু প্রশ্ন থাকে ভুয়া যেগুলো আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যার পর থেকে যেসব প্রশ্ন পাওয়া যায় সেগুলোর সাথে মূল প্রশ্নের সর্বাধিক মিলে যাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।

পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিভিন্ন নেটওয়ার্কে (বিশেষ করে যেসব উৎস প্রশ্ন সরবরাহ করার আশ্বাস দিয়েছিল এবং/ অথবা দিতে পারার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত) খবর রাখে এবং সম্ভাব্য সবার সাথে সবাই যোগাযোগ রক্ষা করে। পরীক্ষার পূর্বে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের নতুন সেট ছাপানো হলেও পরীক্ষার দিন সকালে সেটিও ফাঁস হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, ২০১৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার বাংলা ও ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার খবর প্রচার হতে থাকে। এর মধ্যে এপ্রিলের ৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বাংলা প্রথম পত্রের ‘ক’ সেটের প্রশ্ন ফাঁস হলে পরবর্তীতে ‘খ’ সেটের প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়া হয়। আবার ফরিদপুর ও মাদারিপুর এলাকায় ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্নের ফটোকপি করা অংশের সাথে মূল প্রশ্নের মিল থাকায় ঐ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। কিন্তু বাংলা দ্বিতীয় পত্র ও ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষায় দুই সেট প্রশ্নেরই ফাঁস হওয়ার তথ্য পাওয়া যায় এবং ফাঁস হওয়া প্রশ্নেই পরীক্ষা নেওয়া হয়।[৩০] বহুনির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ও ছড়ানোর বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজতর হওয়ায় এই পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার তথ্য বেশি পাওয়া যায়। ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতার কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার আগে গ্রামাঞ্চলেও প্রশ্ন পৌঁছে যায়।

৩.২.২ ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর মাধ্যম

প্রশ্ন ফাঁস করা ও ছড়ানোর ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত গোষ্ঠী, কোচিং সেন্টার ব্যবসায়ী, গাইড বই ব্যবসায়ী, ফটোকপির দোকান এবং শিক্ষার্থী/ অভিভাবক/ বন্ধু-বান্ধব/ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদানের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। তারা মোবাইলের মাধ্যমে এবং ওয়েবসাইট লিংক বা পেইজের মাধ্যমে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে প্রশ্ন ছড়ানোর কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চিত্র ২: প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়ায় জড়িত সম্ভাব্য অংশীজন

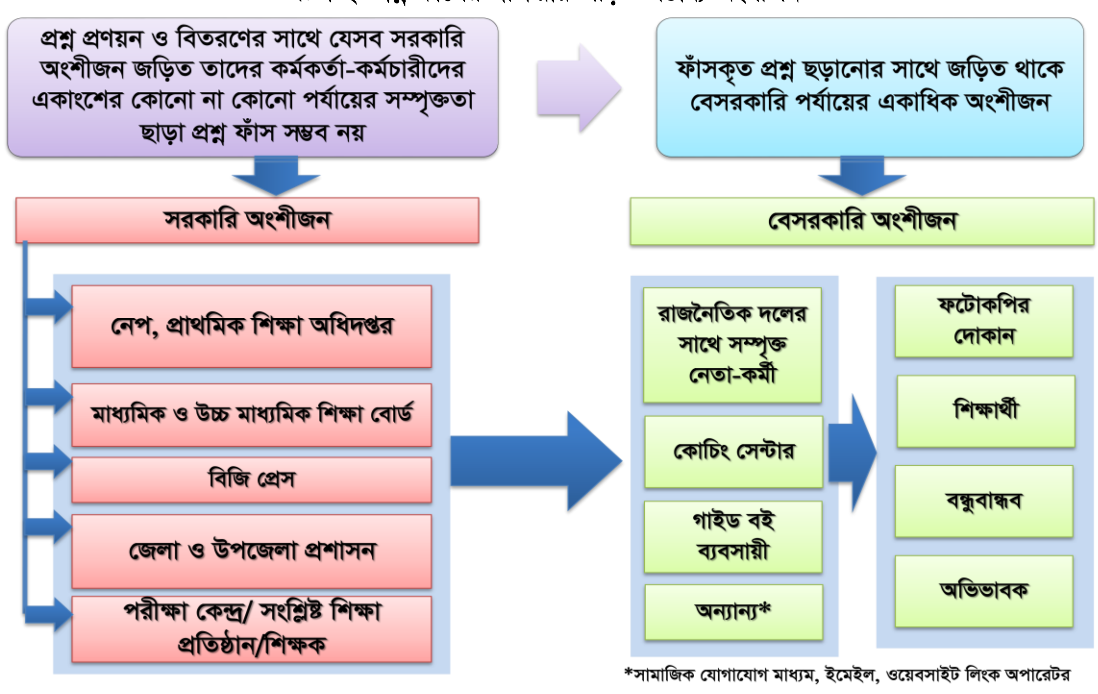

[৩০] ‘পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস’, *দৈনিক যুগান্তর*, ১১ এপ্রিল ২০১৪।

৩.৩ প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়ায় জড়িত সম্ভাব্য অংশীজন

প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়ায় জড়িত সম্ভাব্য অংশীজনের মধ্যে দুই ধরনের অংশীজনের সম্পৃক্ততা দেখা যায়: প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণের পর্যায়ে সরকারি অংশীজন এবং অন্যদিকে, ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর সাথে বেসরকারি পর্যায়ের একাধিক অংশীজন জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায় (চিত্র ২)।

৩.৪ প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি: সরকারি অংশীজনের ভূমিকা

প্রশ্নফাঁসের প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সরকারি অংশীজন কর্তৃক প্রশ্নফাঁসের কয়েকটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যায় যেখান থেকে প্রশ্ন ফাঁসের ঝুকি সৃষ্টি হয়। নিচে এটি বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

ক) প্রশ্ন প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণে সম্ভাব্য ঝুঁকি

পিইসিই: প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে একসেট প্রশ্ন তৈরি হয় এবং একাডেমিতে থেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা পিইসিই'র জন্য একসেট প্রশ্ন তৈরি করেন। ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যতই জোরদার করা হোক না কেন এ পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্তরা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যান কী কী প্রশ্ন তাঁরা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের দ্বারা প্রশ্ন চূড়ান্ত হয়ে যায় বলে এ পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একাংশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকার সুযোগ রয়েছে। ছাপানোর পর বিতরণ পূর্ববর্তী সময়ে সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় একাংশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি থাকে (চিত্র ৩ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৩: প্রশ্ন প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণে সম্ভাব্য ঝুঁকি: *পিইসিই*

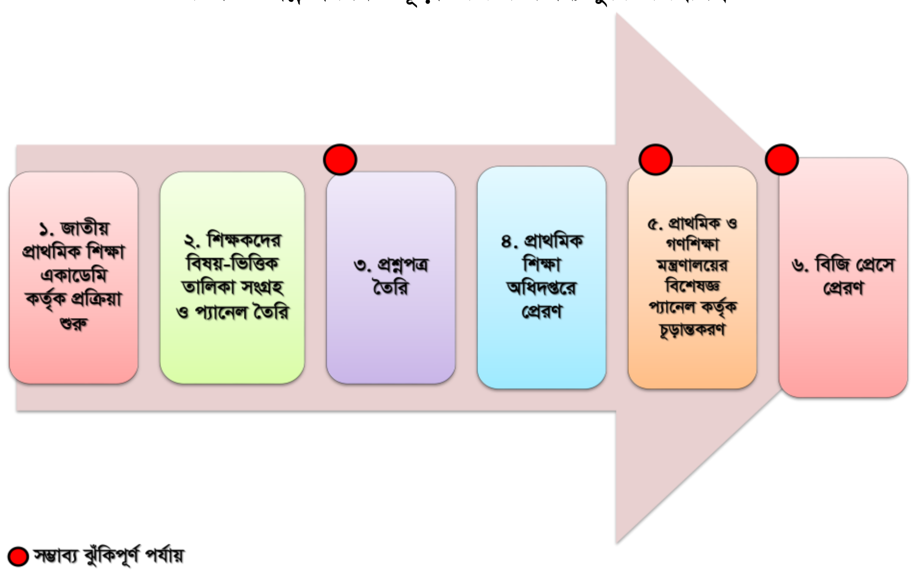

জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা:

- ***প্রশ্ন প্রণয়ন:*** উপরে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট বোর্ডের নির্দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশ্নকর্তা নিয়োগ করার জন্য শিক্ষক বাছাই করার মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রশ্ন প্রণয়নের প্রাথমিক কার্যক্রম। উল্লেখ্য, শিক্ষক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটি সিন্ডিকেট তৈরি হয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়, যারা প্রতিবছরই প্রশ্ন প্রণেতা হিসেবে নিয়োগ পান বলে প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা তৈরি হওয়ায় তাদের একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে তারাই এ বিষয়টিকে পুঁজি করে নিজ নিজ স্কুল ও কোচিং সেন্টারে সাজেশন হিসেবে ঐ প্রশ্নগুলো দিয়ে থাকেন ও আর্থিকভাবে লাভবান হতে থাকেন। গাইড বইয়ের মলাটে 'প্রশ্ন প্রণয়নকারী' বা 'মডারেশনকারী' হিসেবে উল্লেখ থাকার তথ্যও পাওয়া যায়।

- ***প্রশ্ন মডারেশন:*** গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রশ্ন ফাঁসের ক্ষেত্রে যেসব ঝুঁকিপূর্ণ ধাপ রয়েছে তার মধ্যে এ পর্যায়টি অন্যতম। খসড়া প্রশ্নটি মডারেটর নির্ধারিত কক্ষে বসে সিলগালা তুলে প্রয়োজনীয় সংশোধন, বিয়োজন ও পরিবর্তন করেন। প্রয়োজনে প্রশ্ন পুরোটাই বদলে ফেলতে পারেন। আবার এ পর্যায়ে প্রশ্ন চূড়ান্ত হয়ে যায় বলে এ পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকার সুযোগ থেকে যায় (চিত্র ৪ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৪: প্রশ্ন প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণে সম্ভাব্য ঝুঁকি: জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা

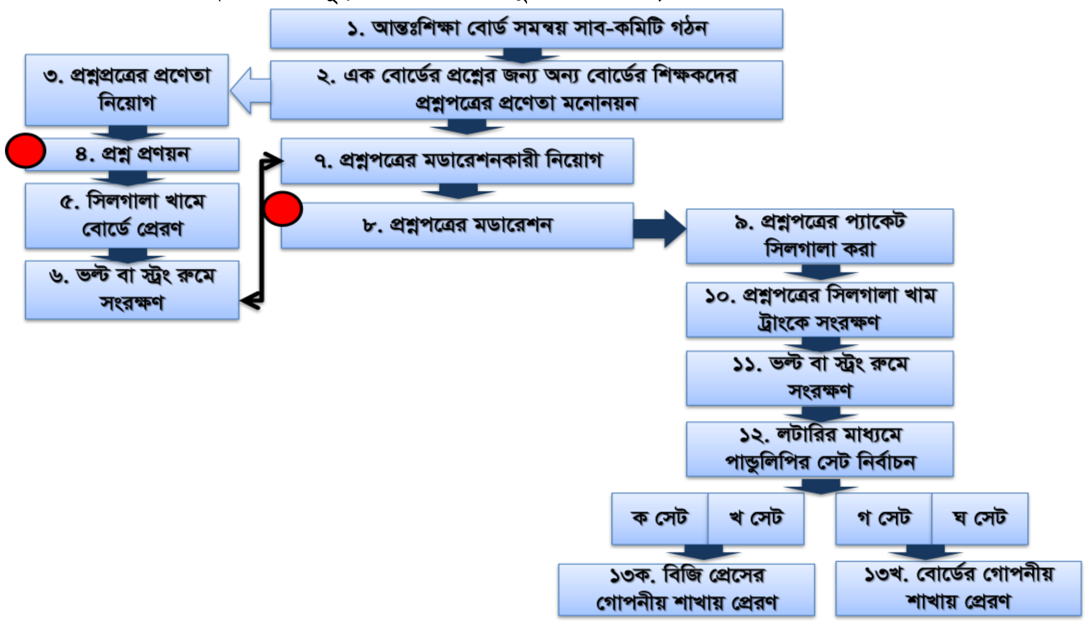

খ) প্রশ্ন ছাপানোর পর্যায়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি: পিইসিই, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা

- ***কম্পোজ, প্রুফ রিডিং, মুদ্রণ:*** কম্পোজার প্রশ্ন দেখার সুযোগ পান বলে কম্পোজ করার সময় একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। মুদ্রণের সময় কম্পোজার হাতে লেখা প্রশ্নের কোনো অংশ বুঝতে না পারলে সংশ্লিষ্ট মডারেটরের কাছে জানতে চাওয়া হয় এবং তখনই মডারেটর মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যান যে তার প্রশ্নগুলো নির্বাচিত হয়েছে। এ পর্যায়েও প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থাকার তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া কম্পোজ হয়ে গেলে সেটির প্রুফ দেখার সময়, প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থাকে। ছাপানোর কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এককভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে প্রশ্ন মুখস্ত করে প্রশ্ন ফাঁস করার তথ্য পাওয়া যায়। আবার কম্পোজের পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কম্পোজার কর্তৃক সংরক্ষণের সময়ও প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থাকার তথ্য পাওয়া যায়। মুদ্রণ কাজ শেষে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত আকার ধারণ করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য গবেষণায় পাওয়া গেছে।

চিত্র ৫: প্রশ্ন ছাপানোর পর্যায়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি: পিইসিই, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা

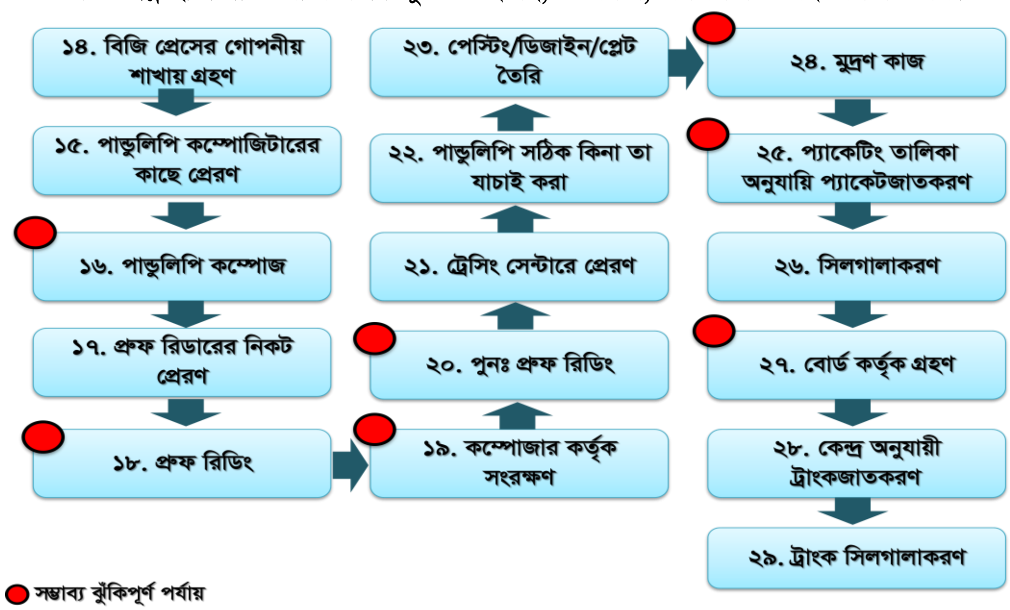

- ***গণনা ও প্যাকেটজাতকরণ:*** ডিজিটাল পেপার কাউন্টার পদ্ধতি না থাকায় যতই নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হোক না কেন প্রশ্ন গণনা ও প্যাকেট করার সময় প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থেকে যায়। প্রশ্ন ছাপানোর পর চাহিদানুযায়ী প্যাকেটজাতকরণে গণনার কাজটি ম্যানুয়ালি করায় এ ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

- ***প্রেস কর্তৃক হস্তান্তর:*** বিতরণ পূর্ববর্তী সময়ে বিজি প্রেস ও বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্তদের একাংশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি থাকে বলে তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, বিজি প্রেস ও বোর্ডের কর্মকর্তাদের মধ্যে ফোনে কথা হওয়ার নিয়ম না থাকলেও বিজি প্রেসে প্রশ্ন ছাপানো সেকশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সেকশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মিত ফোনে ও মোবাইলে যোগাযোগের প্রমান পাওয়া গেছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে বাণিজ্য এমন তথ্য পাওয়া যায় (চিত্র ৫ দ্রষ্টব্য)।

গ) প্রশ্ন বিতরণ পর্যায়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি: পিইসিই, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা

প্রশ্ন সংরক্ষণ ও বিতরণের সময় ছাপানো প্রশ্ন জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ থানা/ ব্যাংক কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে ফাঁস হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। থানায় বা ভল্টে সংরক্ষণ করে রাখার সময় রাতের বেলা পিয়নের কাছে চাবি দিয়ে তার হেফাজতে প্রশ্ন রাখা হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ পর্যায়ে যোগসাজশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি থাকে। পরীক্ষার পূর্ব দিন ট্রাংক খুলে যাচাই করে দেখে পুনরায় সিলগালা করার সময় ও পরীক্ষার দিন সকালে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্তদের দ্বারা ট্রাংকের ভেতরে দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী ঐ দিনের জন্য নির্ধারিত সেটের প্রশ্ন কেন্দ্রে সরবরাহ করার সময় এবং অন্য বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন সহ ট্রাংক পুনরায় সিলগালা করার সময় একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।[৩১]

বহুনির্বাচনী অংশের প্রশ্নের প্যাকেট পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে খোলার নিয়ম থাকলেও এক থেকে দুই ঘন্টা পূর্বেই সিলগালা প্যাকেট খুলে হাতে লিখে বা মুঠোফোনে প্রশ্নের ছবি তুলে খুদে বার্তা, ইমেইল, ফেসবুক, ভাইবারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার কাজে শিক্ষকদের একাংশের সম্পৃক্ত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, বহুনির্বাচনী প্রশ্ন অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করার সুযোগ থাকায় এ প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন ফাঁস অধিক কার্যকর হচ্ছে। এমনকি সৃজনশীল অংশের প্রশ্ন এক-দেড় ঘন্টা পূর্বে পাওয়া গেলেও তার উত্তর তৈরি করে পরীক্ষা দেওয়া খুবই সহজ। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রে ২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নের বহুনির্বাচনী অংশের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে।[৩২]

চিত্র ৬: প্রশ্ন বিতরণ পর্যায়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি: পিইসিই, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা

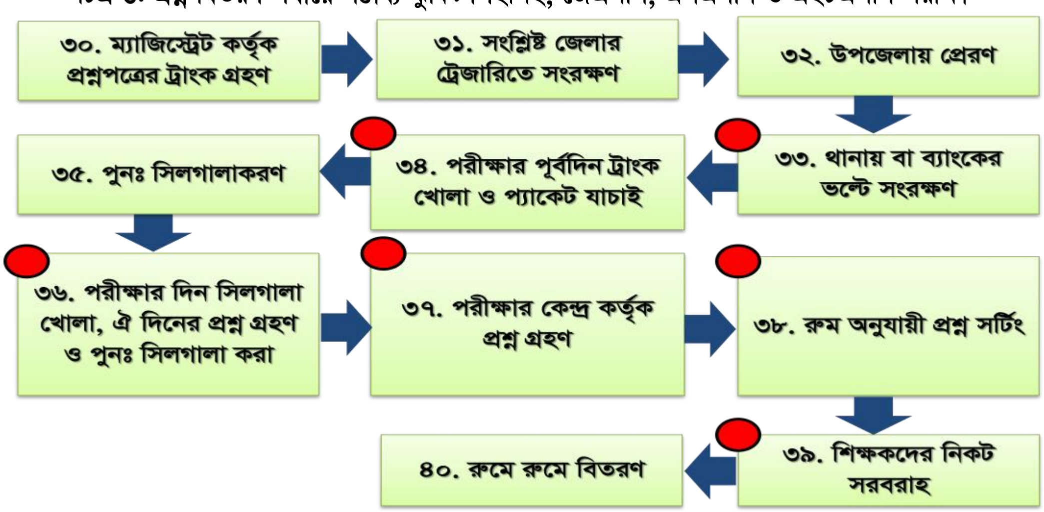

আবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেও প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার তথ্য রয়েছে। কারণ বর্তমানে এক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠানে। এক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস ও তা আদান-প্রদানের অভিযোগের বিষয়টি গবেষণায় উঠে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রে ২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালীন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক রসায়ন প্রথম পত্রের বহুনির্বাচনী অংশের প্রতিটি সেটের একটি

[৩১] ঢাকা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে দলীয় আলোচনা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

[৩২] 'নতুন কৌশলে প্রশ্ন ফাঁস', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ মে ২০১৫।

করে প্রশ্ন কম পান ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের বহুনির্বাচনী অংশের 'ক' সেটের দু'টি প্রশ্ন কম পান। সরিয়ে ফেলা প্রশ্নগুলো উদ্ধারের সময় দেওয়া হলেও অধ্যক্ষ তা করতে পারেন নি। এভাবে প্রশ্ন সর্টিং করার সময় ও শিক্ষকদের নিকট সরবরাহ করার পর প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ার তথ্য পাওয়া যায় (চিত্র ৬ দ্রষ্টব্য)।[৩৩]

৩.৫ প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি: বেসরকারি অংশীজনের ভূমিকা

প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি অংশীজন কর্তৃক ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর বা বিতরণের সাথে জড়িত থাকার কয়েকটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যায়।

৩.৫.১ রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নেতাকর্মী

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত এক ধরনের সিন্ডিকেটের উদ্ভব ঘটেছে যারা অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন ফাঁস করছে। মূলত রাজনৈতিক দলীয় ছাত্র সংগঠনের নেকাকর্মী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কোচিং সেন্টার মিলে একটি সিন্ডিকেট প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সক্রিয় এমন তথ্য পাওয়া যায়।[৩৪] বছরে চারটি পাবলিক পরীক্ষা হওয়ার কারণে সারা বছরই এসব গোষ্ঠী তাদের নেটওয়ার্কগুলো সচল রাখার মাধ্যমে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। প্রধানত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত গোষ্ঠীর একাংশের ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর মাধ্যম হিসেবে কাজ করার তথ্য পাওয়া যায়। এসব ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের একটি অংশ ব্যাপকভাবে সরকারি নিয়োগ ও ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ থাকলেও কিছু অংশের পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সাথেও সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে।[৩৫]

৩.৫.২ কোচিং সেন্টার

- **কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের নেটওয়ার্ক**

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রশ্ন ফাঁস ও বাজারজাত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে কোচিং সেন্টার। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন সংগ্রহ ও ফটোকপি করে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে বিতরণের অভিযোগ রয়েছে অনেক কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। কোচিং সেন্টারগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের দিক থেকে নিয়মিত ও শক্তিশালী তদারকির ঘাটতির সুযোগ নেয় এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে নিয়মিতভাবে প্রশ্ন ফাঁসে সম্পৃক্ত থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। 'নির্দিষ্ট কোচিং সেন্টারের অধিকাংশ শিক্ষার্থী এ+ পায়' বা 'ঐ কোচিং এর সাজেশন বেশি কমন পড়ে'- এ ধরনের কিছু প্রপঞ্চের প্রচলনের বিষয়ে এ গবেষণায় তথ্য পাওয়া যায়। এ কৌশলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরাও উৎসাহিত হন ও ঐসব কোচিং সেন্টারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী কোচিং সেন্টারকে কেন্দ্র করে ও প্রশ্ন ফাঁসকে উদ্দেশ্য করে মূলত চার ধরনের যোগসাজশ লক্ষ করা গেছে। এক্ষেত্রে সকল প্রকার অংশীজনদের মধ্যে উভয়মুখী যোগাযোগ রক্ষা করার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়, কারণ সম্পৃক্তদের সকলের মধ্যে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। যোগসাজশের ধরনগুলো নিম্নরূপ:

প্রথমত, কোচিং সেন্টারগুলো প্রশ্ন পাওয়ার জন্য সরকারি অংশীজনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন প্রণয়ন ও মডারেশনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে নেপ ও শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর একাংশের সাথে যোগাযোগ রাখে। কারণ প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও মডারেশনকারীদের সম্পর্কে সম্ভাব্য ধারণা এসব উৎসের মধ্য থেকে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও মডারেশনকারীদের সাথেও কোচিং সেন্টারের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। আবার ছাপানোর পর্যায়ে বিজি প্রেসে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীর একাংশের সাথে কোচিং সেন্টারের নেটওয়ার্ক বজায় থাকে।

---

[৩৩] 'নতুন কৌশলে প্রশ্ন ফাঁস', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ মে ২০১৫।
[৩৪] 'প্রশ্নফাঁসের মহোৎসব', *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৩ নভেম্বর, ২০১৩।
[৩৫] 'প্রশ্ন ফাঁস: কারণ ও প্রতিকার', *ক্যাম্পাস নিউজ ২৪/* কে আর, ২৮ মে, http://www.campusnews24.com/content/tnews/84

চিত্র ৭: প্রশ্ন ফাঁস ও বাজারজাতকরণের সিন্ডিকেট

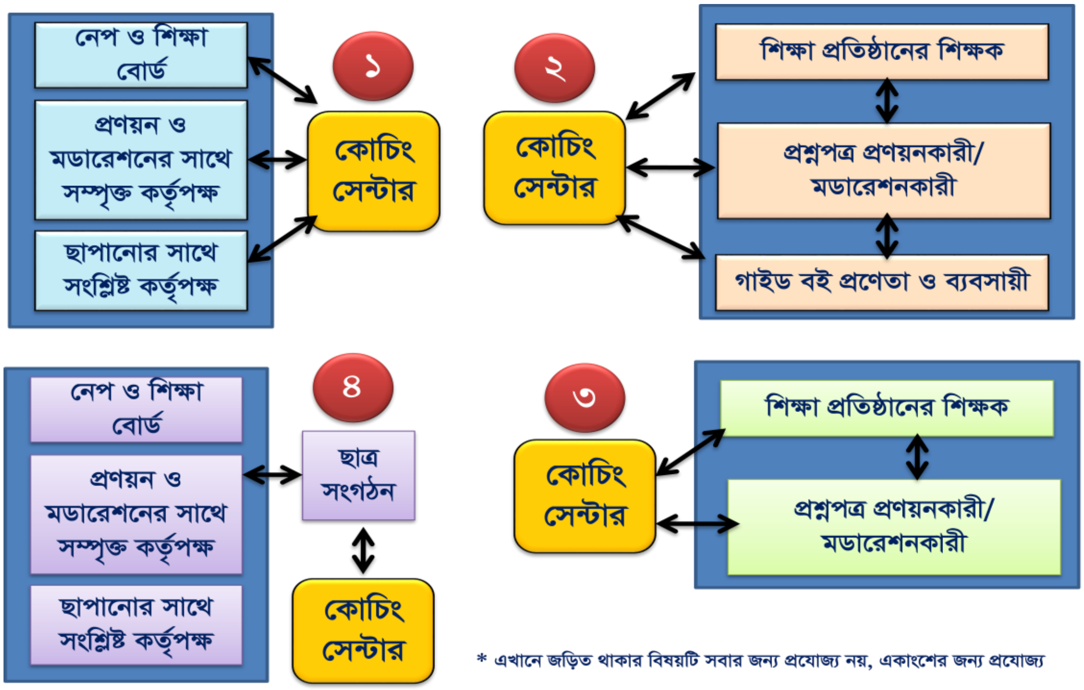

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো শিক্ষক একাধারে প্রশ্ন প্রণয়নকারী বা মডারেশনকারী, গাইড বই প্রণয়ন ও মুদ্রণের ব্যবসা, এবং একইসাথে কোচিং সেন্টারের ব্যবসার সাথে জড়িত থাকে। ফলে কোন বছরে কোন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন করা হবে সে বিষয়ে তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকে। সে অনুযায়ী গাইড বই প্রস্তুত করে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়। কোচিং সেন্টারগুলোও 'সাজেশন' বা 'প্রশ্ন ব্যাংক' হিসেবে একই প্রশ্ন দিয়ে 'জনপ্রিয়তা' অর্জন করতে ও বাণিজ্য অব্যাহত রাখার প্রয়াস পায়। এভাবে গাইড বইতে প্রশ্ন তুলে দিয়ে বাণিজ্য করার সুযোগ তৈরি হয়। কোচিং সেন্টারগুলোও একই গাইড বই অনুসরণ করে ও শিক্ষার্থীদের গাইড বইয়ের প্রশ্নগুলোই সাজেশন হিসেবে দিয়ে দেয় এবং পরীক্ষায়ও একই প্রশ্ন আসতে দেখা যায়। গাইডবইয়ের ব্যবসায়ীদের সাথে সৃজনশীল অংশের প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের মধ্যে যোগসাজশ পাওয়া যায়। গাইড বইয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো সৃজনশীল অংশে হুবহু প্রশ্ন আকারে তুলে দেওয়ার দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।[৩৬]

উল্লেখ্য, গাইড বই ব্যবসায়ীরা এক এক এলাকা লিজ নেয়। নিয়মানুযায়ী, লিজ নেওয়া এলাকায় যতগুলো স্কুল আছে সব ঐ নির্দিষ্ট ব্যবসায়ীদের দখলে/অধীনে থাকে। গাইড বই ব্যবসায়ীরা স্কুলের প্রিন্সিপাল ও শিক্ষকদেরকে বিভিন্ন উপহার দেয় যাতে ঐ নির্দিষ্ট গাইড বই স্কুলের শিক্ষার্থীদের রেফার করা হয়। একটি গাইড বইয়ের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি দাম রাখা হয় গাইড বইগুলোর। গাইড বইগুলো লিখেও দেয় ঐসব স্কুলের শিক্ষকরা। আবার একই শিক্ষক প্রশ্ন প্রণয়নকারী। ফলে গাইড বইটি যেভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে সে অনুযায়ী পরীক্ষার প্রশ্নও করা হয়, তাছাড়া গাইড বই ব্যবসায়ী কর্তৃক বোর্ডের পরীক্ষা শাখায় উপহার পাঠিয়ে দেওয়ার তথ্যও পাওয়া যায়।[৩৭] চূড়ান্তভাবে বলা যায়, শিক্ষক, প্রশ্ন প্রণয়নকারী বা মডারেশনকারী, গাইড বই ও কোচিং সেন্টারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক ধরনের যোগসাজশ প্রতিষ্ঠা হতে দেখা যায়।

তৃতীয়ত, কোচিং সেন্টারের ব্যবসার সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষকের সম্পৃক্ততা থাকতে পারে। এতে কোচিং সেন্টারগুলো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রশ্ন সংগ্রহ করে উক্ত শিক্ষকের মাধ্যমে 'তথাকথিত সাজেশন' হিসেবে একই প্রশ্ন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। আবার অন্যদিকে প্রশ্ন প্রণয়নকারী বা মডারেশনকারীর কোচিং সেন্টারের ব্যবসাও থাকতে পারে। তারা কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে পরীক্ষার প্রশ্ন 'সাজেশন' হিসেবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

চতুর্থত, সরকারি অংশীজন যারা প্রশ্ন প্রণয়ন ও মডারেশন এবং ছাপানোর সাথে সম্পৃক্ত থাকেন তাদের সাথে রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন ও কোচিং সেন্টারের যোগাযোগের মাধ্যমেও প্রশ্ন ফাঁস হয়ে থাকার তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রাজনৈতিক

---

[৩৬] ফাহমিদুল হক, 'পিএসসি পরীক্ষা বাতিল করে ওদের শৈশব ফিরিয়ে দিন', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৬ জানুয়ারি ২০১৫। নমুনা দেখুন পরিশিষ্ট ২।
[৩৭] সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাৎকার, ৩০ জুলাই ২০১৫।

দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকে নীলক্ষেতের ফটোকপির দোকানগুলো। রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছ থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করে কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে বাজারজাত করে থাকে (চিত্র ৭ দ্রষ্টব্য)।[৩৮]

- **কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের নেটওয়ার্ক ও প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া**

এই নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে কোচিং সেন্টারগুলো বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন সংগ্রহ করে। তারপর তাদের কাছে সংরক্ষিত শিক্ষার্থীদের মোবাইল নম্বরের ডাটাবেইজ থেকে নম্বর ব্যবহার করে সরাসরি ফোন করে বা ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ করে। ক্ষেত্রবিশেষে অভিভাবকদের অগোচরে শিক্ষার্থীদের কাছে এসব প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়। আবার পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যার মধ্যে সংক্ষিপ্ত সাজেশন হিসেবে প্রশ্ন সরবরাহ করা হয় যার ৬০-৭০ ভাগ মূল প্রশ্নের সাথে মিলে যায়। উল্লেখ্য, কোচিং সেন্টারগুলো নিজেদের অবস্থান নিরাপদ রেখে এমনভাবে সাজেশন দেয় যাতে পুরো প্রশ্ন হুবহু না মিলে গেলেও অধিকাংশ প্রশ্ন মূল প্রশ্নের সাথে মিলে যায়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন সময় উল্লেখ করেছেন 'বাংলাদেশে ৩২ হাজার কোটি টাকার কোচিং বাণিজ্য হয়'।[৩৯]

৩.৫.৩ ফটোকপির দোকান

প্রশ্ন ফাঁসের সাথে অন্যতম বেসরকারি অংশীজন হিসেবে ভূমিকা রাখছে ফটোকপির সাথে সংশ্লিষ্টরা। মূলত প্রশ্ন ফাঁসের পরপরই ফটোকপির মাধ্যমে বিতরণের জন্য ফটোকপি দোকানগুলো কাজ করে। তারা মোবাইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রশ্ন পাওয়ার সাথে সাথে অনুলিপি বানিয়ে বিতরণ করে। আবার, ফাঁসকৃত প্রশ্ন পাওয়ার জন্য ফটোকপির দোকানে গিয়ে খোঁজ নেওয়া ও অর্থের বিনিময়ে ঐসব প্রশ্ন যোগাড় করার তথ্যও পাওয়া যায়। তারা পরীক্ষাগুলোকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন পাওয়ার বিভিন্ন উৎস যেমন কোচিং সেন্টারসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের একাংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং আর্থিকভাবে লাভবান হয়। ফটোকপি করার সময় হাতে লেখা প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিলির উদ্দেশ্যে ফটোকপি করার দায়ে এক কিন্ডারগার্টেনের মালিক ও ফটোকপি ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক কারাদণ্ড দেওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৪০]

৩.৫.৪ শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন

প্রশ্ন ফাঁসের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এক ধরনের যোগসাজশের প্রবণতা লক্ষণীয়। ক্ষেত্রবিশেষে ফাঁসকৃত প্রশ্ন পেলে সেগুলো অন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরকে স্বেচ্ছায় প্রদান করা ও প্রচার করার মানসিকতা দেখা যায়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার সব প্রশ্নই শিক্ষার্থীরা পেয়েছিল এবং পাওয়া প্রশ্নের প্রায় সবগুলোই মিলে গিয়েছিল। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় এসব প্রশ্ন অন্য অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর কাছে বিতরণ করেছিল। অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষায়ও এ ধরনের প্রবণতা লক্ষণীয়।

৩.৫.৫ অন্যান্য (মোবাইল, সামাজিক যোগাযোগ, ওয়েবসাইট লিংক ওপারেটর)

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে মোবাইল, ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ওয়েবসাইটের বিভিন্ন লিংক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর তথ্য পাওয়া যায়। আবার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পর পরই সামাজিক যোগাযোগ মাধমে বিভিন্ন পোস্ট বা লিংকের মাধ্যমে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও পেজগুলোতে লেখা থাকে 'এটা প্রশ্ন নয়, সাজেশন। তবে সাজেশন শতভাগ মিলে যাবে'।[৪১] গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ফেসবুকে প্রায় ৫০টি অ্যাকাউন্ট রয়েছে যেগুলোতে নিয়মিতভাবে সব পরীক্ষার আগে সাজেশন আকারে প্রশ্ন দেওয়া হয়।[৪২] প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পরপরই ইমেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন ওয়েবসাইটের পোস্ট বা লিংকের (উত্তরসহ বা উত্তরছাড়া) মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার তথ্য পাওয়া যায়।[৪৩]

৩.৬ প্রশ্ন বিনিময়ের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের ধরন

প্রশ্ন প্রণয়নের সময় থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সংশ্লিষ্টদের সক্রিয় থাকার তথ্য পাওয়া যায়। তারা মূলত প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার প্রয়াস চালায়। তবে কোনো কোনো অংশীজনের আর্থিক লেনদেন ছাড়াই প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত থাকার প্রবণতা দেখা যায়, যেমন মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওয়েবসাইটের লিংক আদান-প্রদানের

[৩৮] 'প্রশ্ন ফাঁসের মহোৎসব', *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৩ নভেম্বর ২০১৩ ও সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাৎকার, ৩০ জুলাই ২০১৫।

[৩৯] 'কোচিং বাণিজ্যের ফাঁদে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি', *দৈনিক যায়যায়দিন*, ১ অক্টোবর, ২০১৪; মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মন্তব্যটি করেছেন ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

[৪০] 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ নভেম্বর ২০১৪।

[৪১] 'প্রশ্নফাঁস বন্ধে অধিদপ্তরের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন', *দৈনিক মানবজমিন*, ২৮ নভেম্বর ২০১৪।

[৪২] 'বেকায়দায় মন্ত্রী ফিজার', *দৈনিক ভোরের পাতা*, ৩০ নভেম্বর ২০১৪।

[৪৩] এ সংক্রান্ত কিছু নমুনা দেখার জন্য পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য।

সাথে যারা জড়িত এবং আত্মীয়-স্বজনদের একাংশ যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দেওয়ার জন্য ‘সাহায্য’ করার নামে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন যোগাড় করা বা শিক্ষার্থীর কাছে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে জড়িত থাকে।[৪৪] আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে প্রশ্ন ফাঁস করা ও বিতরণ এবং ফাঁস হওয়া প্রশ্ন হাতে পাওয়ার ক্ষেত্রে ২০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা[৪৫] পরিমাণ পর্যন্ত পরিশোধের তথ্য পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের জন্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরনের চুক্তির বিষয়ে জানা যায়।

- **গোষ্ঠীগত ও এককভাবে মূল্য পরিশোধ:** ফাঁসকৃত প্রশ্ন পেতে কখনো এককভাবে এবং কখনো গোষ্ঠীগতভাবে (যেমন কোচিং সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) অর্থের বিনিময় হয়ে থাকে। ফাঁসকৃত প্রশ্ন পাওয়ার জন্য সমন্বিত ও সুসংগঠিত কৌশলে অর্থ পরিশোধের তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, কিছু কিছু কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন কেনার জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়। এমনকি পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেই অর্থ আদায় করারও উদাহরণ রয়েছে। এক্ষেত্রে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত বাজেট রাখার তথ্য পাওয়া যায়।[৪৬] আবার প্রশ্নের বিনিময়ে কোচিং সেন্টারগুলোরও ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করার তথ্য পাওয়া যায়।[৪৭] আবার চুক্তি অনুযায়ী শিক্ষার্থী বা অভিভাবক কর্তৃক প্রশ্ন যোগানদাতাকে এককভাবেও মূল্য পরিশোধ করার বিষয়ে জানা যায়। এক্ষেত্রে ২০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়।[৪৮] কিছু শিক্ষক বিভিন্নভাবে প্রশ্ন সংগ্রহ করে কোচিং সেন্টারে প্রশ্ন যোগান দেয়। তবে এক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ নির্ভর করে সুবিধাভোগী কত তার ওপর। কারণ বিনিয়োগের তুলনায় রিটার্ন না হলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এ সুযোগে শিক্ষকরাও দর-কষাকষির সুযোগ পান।[৪৯]

- **প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আর্থিক লেনদেন:** আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সরাসরি অর্থ লেনদেনের ঘটনা ঘটে, যেমন ফ্লেক্সি লোড বা প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্ন সরবরাহকারীকে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করা হয়। আবার প্রশ্ন সরবরাহকারীকে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে পরোক্ষভাবেও চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করার তথ্য পাওয়া যায়।

- **ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মূল্য পরিশোধ:** বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানেও আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়। প্রশ্নের ধরন, প্রশ্ন পাওয়ার সময়, স্থান ও প্রশ্ন প্রদানকারী ভেদে অর্থের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। যেমন প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পূর্বে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকে, আবার প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পর অর্থ পরিশোধ করা হয়, এমনকি পরীক্ষায় প্রশ্ন মিলে যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করার ঘটনাও ঘটতে দেখা যায় (চিত্র ৮ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৮: প্রশ্ন ফাঁসে অর্থের সংশ্লিষ্টতা

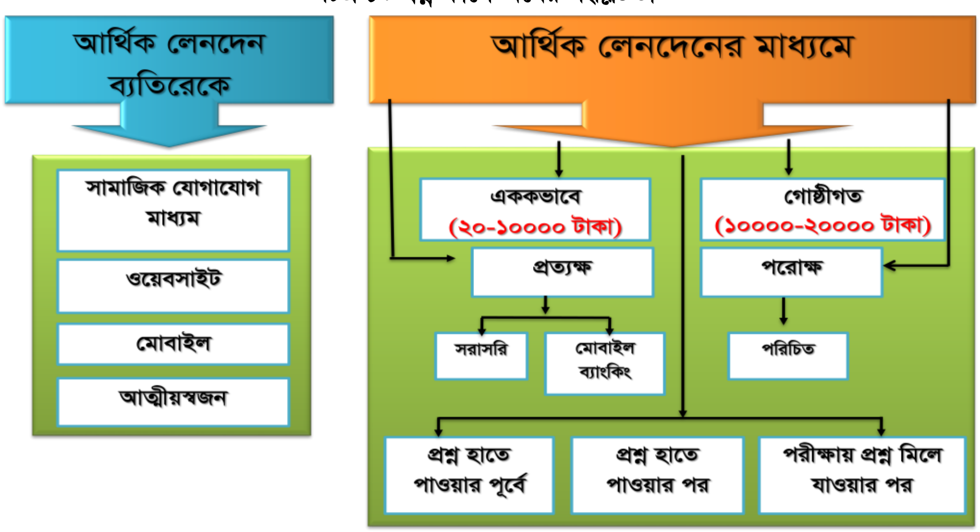

---

[৪৪] উল্লেখ্য, গবেষণায় সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফেসবুকের মাধ্যমে ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকার আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়। উৎস: ‘প্রশ্ন ফাঁস করে পরীক্ষা, ৯৮% জিপিএ-৫’, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৩০ জুলাই ২০১৫।

[৪৫] নিজামুল হক, ‘বন্ধ হচ্ছে না প্রশ্ন ফাঁস’, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ এপ্রিল ২০১৪ ও একাধিক প্রাথমিক উৎস হতে সংগৃহীত।

[৪৬] একজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

[৪৭] একজন অভিভাবকের সাক্ষাৎকার, ৪ জুলাই ২০১৫।

[৪৮] নিজামুল হক, ‘বন্ধ হচ্ছে না প্রশ্ন ফাঁস’, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ এপ্রিল ২০১৪।

[৪৯] একজন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার, ৩০ জুলাই ২০১৫।

৩.৭ প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনি কাঠামো ও এর সীমাবদ্ধতা

প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে আলাদা কোনো আইন নেই। তবে 'পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২'-তে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সম্পৃক্তদের জন্য শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে কোচিং সেন্টার ও গাইড বই ব্যবসায়ীদের একটি মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। কোচিং সেন্টার ও গাইড বই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ইতোমধ্যে আইন ও নীতিমালা প্রণীত হয়েছে, যেমন 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা, ২০১২' এবং 'নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) আইন, ১৯৮০'।

ক) পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২: এই আইনে কোনো পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে কোনো প্রশ্ন সংবলিত কোনো কাগজপত্র অথবা পরীক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে বলে মিথ্যা ধারণা দিয়ে কোনো প্রশ্নের সাথে হুবহু মিল আছে বলে বিবেচিত হওয়ার অভিপ্রায়ে লিখিত কোনো প্রশ্ন সংবলিত কোনো কাগজ যে কোনো উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করলে চার বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে [ধারা ৪ (ক) ও (খ)]। উল্লেখ্য, পাবলিক পরীক্ষা অপরাধ আইন ১৯৮০ অনুযায়ী ১০ বছরের শাস্তির বিধান ছিল। কিন্তু উক্ত আইনের অধীনে কোনো অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। অথচ ১৯৯২ সালে ঐ আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে শাস্তির মাত্রা কমিয়ে চার বছর করার পরও এখন পর্যন্ত কোনো শাস্তি প্রদানের নজির নেই।

খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২: কোচিং বন্ধের লক্ষ্যে অভিভাবক ফোরাম হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন (নং-৭৩৬৬/২০১১) দায়ের করে। এই প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর কোচিং বাণিজ্য বন্ধে আদেশ জারি করে, যার ভিত্তিতে সরকার 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২' নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। যার ভূমিকা অংশে কোচিং বাণিজ্যের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এটি বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা কোচিং বাণিজ্যের সাথে যুক্ত শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন ... এছাড়া অনেক শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে পাঠদানে কম মনোযোগী হয়ে কোচিং এ বেশি সময় ব্যয় করছেন"। এ নীতিমালায় যেসব শাস্তির উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

- এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও এমপিওবিহীন শিক্ষক; এমপিওবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক জড়িত থাকলে এমপিও স্থগিত বা বাতিল, বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন একধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত।
- এসএমসি কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সরকার কর্তৃক পর্ষদ ভেঙ্গে দেওয়া ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি, অধিভুক্তি বাতিল করা হবে।
- সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক জড়িত থাকলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু প্রণীত নীতিমালায় অনেক অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। যার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের একটি অংশ এবং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের একাংশের মাধ্যমে কোচিং সেন্টারের সাথে সম্পৃক্ত থেকে এটির বাণিজ্যিক প্রসারে ভূমিকা অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। যেমন:

- এখানে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য নিয়ে বলা হয়েছে। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে অনেকের এ বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায়, ফলে তারা কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।
- সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বলা হয় নি। যেমন, ইংরেজি মাধ্যমকে নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে তারা ইংরেজি মাধ্যমের পাশাপাশি বাংলা মাধ্যম নিয়েও কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে।
- কোচিং এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে [১(চ)] সে অনুযায়ী কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত) কোনো শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত ক্লাসের বাইরে, আগে বা পরে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বা বাইরে কোন স্থানে পাঠদান করানোকে বোঝানো হলেও [২(ক)] অভিভাবকদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত ক্লাসের আগে বা পরে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রাখার কথা বলা হয়েছে এবং একটি বিষয়ে মাসে সর্বনিম্ন ১২টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হওয়া ও প্রতিটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। প্রকারান্তরে প্রণীত সংজ্ঞা অনুযায়ী তা কোচিং-এরই নামান্তর।
- কোনো শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং করাতে পারবে না এমন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। তাহলে বলা যায় অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এসে কোচিং করাতে পারবে [৩]।

- কোনো শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং করাতে না পারলেও প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি নিয়ে প্রতিদিন সীমিত সংখ্যক (১০ জনের বেশি নয়) শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ানোর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে প্রাইভেট পড়ানোকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আবারও প্রণীত সংজ্ঞা অনুযায়ী তা কোচিং এরই রূপান্তর/নামান্তর [৩]।

গ) নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) আইন ১৯৮০: মুখস্থবিদ্যা ও গাইডবই নির্ভরতা কমাতে এবং একইসাথে চিন্তাশক্তি বাড়াতে ১৯৮০ সালে নোট বই নিষিদ্ধ করে এ আইনটি প্রবর্তিত হয়। এ আইনের ধারা ২ (খ) অনুযায়ী, 'নোট বই' বলতে বোঝায় 'বোর্ড বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ছাড়া প্রকাশিত এমন বই যাতে পাঠ্যবইয়ের কোনো বিষয়ের ওপর নোট, ব্যাখ্যা, মন্তব্য বা রেফারেন্স অথবা পাঠ্যবইয়ের কোনো প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান দেয়া থাকে অথবা পাঠ্যবইয়ের কোনো বিষয় বা অধ্যায়ের অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়। এ আইনের ধারা ৩ (১), ৪ (১) অনুযায়ী, "কোন ব্যক্তি নোট বই, মুদ্রণ, প্রকাশনা, আমদানি, বিক্রয়, বিতরণ অথবা কোনো প্রকারে উহার প্রচার করিতে বা মুদ্রণ, প্রকাশনা, বিক্রয়, বিতরণ কিংবা প্রচারের উদ্দেশ্যে রাখিতে পারিবেন না", যার ব্যত্যয় হলে সর্বোচ্চ ৭ বছরের জেল অথবা সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান আছে।

আইনের প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অননুমোদিত বই, নোট বই ও গাইড বই বাজারজাত বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টের সাহায্য নিতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের এ নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ২০০৮ সালের ১৩ মার্চ এই আইনের আওতায় গাইড বইও নোট বইয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে নোট বইয়ের সঙ্গে গাইড বইও বাজারজাত ও বিক্রি নিষিদ্ধ করে মন্ত্রণালয়ের আদেশ বহাল রাখে।[৫০] তবে গাইড বই বন্ধে সুনির্দিষ্ট আইন থাকলেও বিভিন্ন বইয়ের আদলে (সৃজনশীল সুপার সাজেশন, সৃজনশীল গাইড, সহায়ক গ্রন্থাবলী) মূলত গাইড বই সহজলভ্য রয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তির দৃষ্টান্ত না থাকার তথ্য পাওয়া যায়। অথচ 'সৃজনশীল গাইডবই' প্রকাশিত হওয়ার অর্থই হল অসৃজনশীল পদ্ধতিতে সৃজনশীলতার চর্চা।[৫১]

(ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬: এই আইন তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত। এ আইনের ধারা ৬৩ (১) অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি এ আইন বা এর অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোনো বিধানের অধীন কোনো ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোনো বিষয়বস্তুতে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত হয়ে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোনো বিষয়বস্তু অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করে তাহলে তার এ কাজ হবে একটি অপরাধ। উল্লিখিত ধারা ভঙ্গ করলে পরবর্তী ধারা অনুযায়ী [৬৩(২)] সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড বা দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে কোনো ব্যক্তি ফেসবুক বা অন্য কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস বা ফাঁসের গুজব ছড়ালে, লাইক দিলে বা শেয়ার করলে এ আইনের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[৫২]

৩.৮ প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিষয়টি অস্বীকার করলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়, যদিও এসব পদক্ষেপের পরও প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। এর মধ্যে আইনি, তদন্ত কমিটি গঠন এবং তদারকি ও পরিবীক্ষণমূলক ব্যবস্থা জোরদার করা সংক্রান্ত পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য।

৩.৮.১ আইনি পদক্ষেপ

- **প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে গ্রেফতার ও দণ্ড:** এখন পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার ও বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। ২০১৪ সালের নভেম্বরের ২৪ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষার হাতে লেখা প্রশ্ন সরবরাহ করার অভিযোগে বগুড়া জেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন শিক্ষককে একবছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও একই অভিযোগে এক কোচিং সেন্টারের পরিচালককে পাঁচ হাজার টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করে বগুড়া সদর থানার ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক।[৫৩] ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন সময় প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত সন্দেহে একটি সিন্ডিকেটের একজন সদস্যকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করে। গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত ফেসবুকের ভুয়া

---

[৫০] এর শুনানি হলে পরবর্তীতে ২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর হাইকোর্ট একই রায় দেয়। সূত্র: 'অতিরিক্ত ভর্তি ফি ও গাইড বই: উচ্চ আদালতের আদেশ', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৪ জানুয়ারি, ২০১২।

[৫১] ফাহমিদুল হক, 'পিএসসি পরীক্ষা বাতিল করে ওদের শৈশব ফিরিয়ে দিন', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৬ জানুয়ারি ২০১৫।

[৫২] 'ফেসবুকে 'প্রশ্ন' লাইকেও অপরাধ', *বাংলানিউজ২৪ডটকম*, ৩০ জুলাই ২০১৫।

[৫৩] 'পিএসসির প্রশ্ন ফাঁসে তিন শিক্ষকের জেল', *রাইজিংবিডি.কম*, ২৩ নভেম্বর ২০১৪;
http://www.risingbd.com/detailsnews.php?nssl=78523|

আইডি ব্যবহার করে বিভিন্ন সোর্স থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন আর্থিক মূল্যে আদান-প্রদানের বিষয়টি স্বীকার করে।[৫৪] এছাড়া ২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন প্রশ্ন ফাঁস, উত্তরপত্র জালিয়াতি এবং ফেসবুক ও মোবাইল ফোনে তা ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) 'সাইবার অপরাধ' দলের ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে। শক্তিশালী এ চক্রের সাথে কয়েকটি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা শাখার কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার প্রমাণও পাওয়া গেছে বলে জানা যায়।[৫৫]

- **থানায় অভিযোগ ও মামলা দায়ের:** এখন পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে চারজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ ও মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঢাকা বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রে ২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নের বহুনির্বাচনী অংশের প্রশ্ন ফাঁস করার অভিযোগের প্রেক্ষিতে একটি কলেজের সংশ্লিষ্ট প্রভাষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।[৫৬] একই ঘটনায় উক্ত অভিযুক্তকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় ও কলেজের পরীক্ষা কমিটি বাতিল করা হয়।[৫৭] ঢাকা বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রে ২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষার রসায়ন প্রথম পত্রের বহুনির্বাচনী অংশ এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের বহুনির্বাচনী অংশের 'ক' সেটের দু'টি প্রশ্ন সরিয়ে ফেলার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট কলেজের দুইজন শিক্ষক ও একজন অফিস সহকারীর বিরুদ্ধে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মামলা দায়ের করেন[৫৮] ও তাদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[৫৯]

৩.৮.২ পরীক্ষা স্থগিত ও কেন্দ্র বাতিল করা

- **পরীক্ষা স্থগিত:** বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠলেও এখন পর্যন্ত প্রশ্নফাঁসের জন্য একটি পরীক্ষা স্থগিত করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় এপ্রিল ১০, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।
- **কেন্দ্র স্থগিত:** ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রশ্নপত্রের প্যাকেট পাওয়ার পর স্মার্টফোনসহ আধুনিক ডিভাইসের মাধ্যমে ছবি তুলে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করার অভিযোগে বরগুনা জেলার আমতলির একটি কেন্দ্র স্থগিত করা হয়।

৩.৮.৩ তদন্ত কমিটি গঠন

গত পাঁচবছরে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে এ পর্যন্ত চারটি তদন্ত কমিটি গঠন করার তথ্য পাওয়া যায়।

- ২০১৪ সালে ঢাকা বোর্ডের এইচএসসির ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠার পর পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। পরদিন সোহরাব হোসেনকে[৬০] প্রধান করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাছাড়া কমিটিকে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগের সার্বিক বিষয় তদন্ত করে এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সব পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ দিতে বলা হয়।[৬১] এই তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে পরীক্ষার দিন সকালে লটারির মাধ্যমে প্রশ্নপত্রের সেট নির্ধারণ, বেশিসংখ্যক সেটের প্রশ্ন প্রণয়নসহ মূল চারটি সুপারিশ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, ব্যবস্থাপক, প্রযুক্তিবিদদের সাথে কথা বলে কিছু সাধারণ সুপারিশ করা হয়। প্রতিবেদনে প্রশ্ন প্রণয়নে প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ইন্টারনেটনির্ভর। এজন্য একটি অবকাঠামো গড়ে তোলার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশ্ন প্রণয়নের মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা কমিয়ে আনার কথাও বলা হয়েছে প্রতিবেদনে।[৬২]
- ২০১৪ সালের এইচএসসি ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব আব্দুস সালাম হাওলাদারের নের্তৃত্বে গঠিত আরেকটি কমিটি তাদের প্রতিবেদন ১৮ মে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে জমা দিয়েছে।

---

[৫৪] 'ফেসবুকে প্রশ্ন ফাঁসকারী গ্রেফতার', *দৈনিক যায়যায়দিন*, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

[৫৫] 'প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত সাইবার চক্রের সন্ধান: আটক ৬', *দৈনিক সমকাল*, ২১ জুলাই ২০১৫।

[৫৬] 'নতুন কৌশলে প্রশ্ন ফাঁস', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ মে ২০১৫।

[৫৭] 'নতুন কৌশলে প্রশ্নফাঁস', *দৈনিক যুগান্তর*, ২৬ মে ২০১৫।

[৫৮] 'নতুন কৌশলে প্রশ্ন ফাঁস', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ মে ২০১৫।

[৫৯] 'নতুন কৌশলে প্রশ্নফাঁস', *দৈনিক যুগান্তর*, ২৬ মে ২০১৫।

[৬০] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) সোহরাব হোসেন তদন্ত কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

[৬১] *প্রশ্ন ফাঁসে তদন্ত কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন*, ২৩ জুন ২০১৪, *টিনিউজ ২৪৭.কম*। http://www.tnews247.com/education/article-12920.html

[৬২] এ গবেষণার প্রয়োজনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের জন্য তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করা হলেও গবেষণা দলকে কোনো ধরনের প্রতিবেদন সরবরাহ করা হয় নি।

বক্স ২: প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা - যে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়

২০১৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষার সময় প্রথম থেকেই এ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ আসতে থাকে। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার অভিভাবকের দাবি, ইতোমধ্যে নেওয়া বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষার প্রশ্ন তারা পেয়েছেন। ইংরেজি ২য় পত্রের প্রশ্ন চারদিন আগে থেকেই বিক্রি হচ্ছিল। অভিভাবকরা জানান, ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষায় 'ক' সেট প্রশ্ন ফাঁস হয়। কর্তৃপক্ষ আগেভাগে জেনে যাওয়ায় তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্তে অন্য সেটে বাংলা প্রথমপত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তবে বাংলা দ্বিতীয়পত্র ও ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষায় দুই সেট প্রশ্ন ফাঁস হয় বলে অভিভাবকরা দাবি করেন। ইংরেজি ২য় পত্রের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ জোরালো হওয়ার কারণে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষার ব্যাপারে সারাদেশের প্রশাসনকে আগেভাগেই তৎপর রাখা হয়েছিল। বুধবার সন্ধ্যায় ফরিদপুরের নগরকান্দায় দুটি ফটোকপি দোকান থেকে কথিত প্রশ্ন ফটোকপি হচ্ছে এমন খবরের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তা জেলা প্রশাসকের (ডিসি) মাধ্যমে ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন। এরপর কথিত প্রশ্ন সংগ্রহ করে মূল প্রশ্নপত্রের সাথে হুবুহু মিল পাওয়া যায়। প্রশ্ন মিলে যাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তারা বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করেন। মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেন। জানা যায়, এর বাইরে মাদারীপুর থেকেও এই প্রশ্ন ফটোকপিকালে একজনকে আটক করা হয়েছে।

সূত্র: 'পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস', *দৈনিক যুগান্তর*, ১১ এপ্রিল ২০১৪।

- ২০১৩ সালের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় প্রায় সব বিষয়েই প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। দুটি বিষয়ে প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ মিললেও ওইসব পরীক্ষা বাতিল করা হয়নি। পরীক্ষা বাতিল না করার কারণ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, "শিশুদের শাস্তি দেয়া সম্ভব হচ্ছে না"। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনার মুখে ২৩ নভেম্বর তৎকালীন অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে। তদন্তে বাংলা বিষয়ের ৫৩ শতাংশ এবং ইংরেজির ৮০ শতাংশ প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রমাণও পাওয়া যায়।[৬৩] এই কমিটি প্রশ্ন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে বিজি প্রেসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও গোপনীয় ছাপাখানা আধুনিকায়ন করা, চিহ্নিত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক এবং সন্দেহের তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করে আইনানুগ শাস্তি প্রদানসহ সাতটি সুপারিশ করে।[৬৪]
- ২০১৩ সালের ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া জেএসসি পরীক্ষায় ইংরেজি, গণিত, পদার্থ, রসায়ন, হিসাববিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।[৬৫]

৩.৮.৪ তদারকি ও পরিবীক্ষণমূলক ব্যবস্থা

- **নজরদারি বৃদ্ধি:** ২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালীন বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঢাকা বোর্ড রাজধানীর মোট ৬৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ১৭টি কেন্দ্রকে প্রশ্ন ফাঁসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে নজরদারি বৃদ্ধি করেছে।[৬৬] ২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে প্রশ্নের নিরাপত্তার বিষয়ে বিজি প্রেসের কর্মকর্তাদের সাথে পুলিশ প্রশাসনের সদস্যদের নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বৈঠক করে। উক্ত বৈঠকে প্রশ্ন ফাঁসকারী চক্রের হোতাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে নানা পদক্ষেপের মধ্যে ফেসবুকের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস না হওয়ার জন্য বিটিআরসি'র সাহায্য চাওয়া হয় ও কোচিং সেন্টারগুলোর ওপর নজরদারি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়।[৬৭]
- **মনিটরিং সেল গঠন:** ফেসবুক ছাড়াও অন্য কোনোভাবে যেন কোনো চক্র প্রশ্ন ফাঁস করে বা ভুয়া প্রশ্ন ছড়িয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (মনিটরিং সেল) গঠন করেছে। পাবলিক পরীক্ষা চলাকালীন এ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা রাখা হয় ২৪ ঘন্টা।[৬৮]
- **বিজি প্রেসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার:** বিভিন্ন মাধ্যমে প্রশ্নফাঁসে বিজি প্রেসকে দায়ী করার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে বিজি প্রেসে ২০১০ সাল থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। যেমন: বিজি প্রেসে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা, প্যাকেটিং

---

[৬৩] আশরাফুল ইসলাম গণমাধ্যমে জানান, "প্রশ্নফাঁসের সাথে কিছু লোক জড়িত রয়েছে। আমরা তাদের শনাক্তের চেষ্টা করেছি। অবশ্যই অ্যাকশন নেব।" সূত্র: 'প্রশ্ন ফাঁসে তদন্ত কমিটি শেষ কথা নয়', *আলোকিত বাংলাদেশ*, ১৩ এপ্রিল ২০১৪।

[৬৪] 'প্রশ্ন ফাঁসে তদন্ত কমিটি শেষ কথা নয়', *আলোকিত বাংলাদেশ*, ১৩ এপ্রিল ২০১৪।

[৬৫] 'প্রশ্ন ফাঁসের মহোৎসব', *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৩ নভেম্বর ২০১৩।

[৬৬] 'নতুন কৌশলে প্রশ্নফাঁস', *দৈনিক যুগান্তর*, ২৬ মে ২০১৫।

[৬৭] 'প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে নানা পদক্ষেপ, নজরদারিতে কোচিং সেন্টার', http://ajkerpatrika.com/first-page/2015/03/20/26336, (৪ জুলাই ২০১৫)।

[৬৮] সচিবালয়ের ৬ নম্বর ভবনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৭২২ নম্বর কক্ষে প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষা সংক্রান্ত এ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ফোন নম্বর: ৯৫৪৯৩৯৬, ০১৭৭৭৭০৭৭০৫, ০১৭৭৭৭০৭৭০৬। এছাড়াও সবার জন্য সার্বক্ষণিক যোগাযোগে একটি ইমেইল আইডিও খোলা হয়েছে- examcontrolroom@moedu.gov.bd। উৎস: http://www.somoyerkonthosor.com/news/171014, (৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫)।

রুমে সিসি ক্যামেরা লাগানো, নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা (২ জন এসআই, ২ জন আনসার; পূর্বে ১জন ছিল), যারা গোপনীয় শাখায় কাজ করেন তাদের পোশাক পরিবর্তন করা (পকেট এবং বর্ডার না থাকা), প্রশ্ন ছাপানোর কাজ শেষ করার পর কর্মীদের সম্পূর্ণ চেক করা, গোপনীয় শাখার কাজের পুরো প্রক্রিয়াটি রেকর্ড করা, কম্পিউটারে ইউএসবি পোর্ট স্টিলের পাত দিয়ে সিলগালা করে দেওয়া (পেন ড্রাইভে কপি না করার জন্য), তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুসারে দ্বৈত তালা চাবি (ডাবল লক এন্ড কি) সিস্টেম চালু করা। এছাড়াও বিজি প্রেসের প্রশ্ন শাখাকে অন্য মুদ্রণ শাখা থেকে পুরোপুরি আলাদা করা হয়েছে, এবং গোপনীয় শাখা পুরোপুরি মূল প্রেস ভবন থেকে আলাদা করা হয়েছে। প্রশ্ন শাখায় মেটাল ডিটেক্টর, পেপার ডিটেক্টর, ভল্ট ডোর, গোপন ক্যামেরা, সিসিটিভি বসানো হয়েছে। গোপনীয় ইউনিটের প্রবেশপথ ও বিজি প্রেসের সাধারণ শাখায় আলাদা আলাদা প্রবেশ পথ তৈরি ও প্রবেশপথে অত্যাধুনিক আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর স্থাপন করা হয়েছে। গোপনীয় শাখার মুদ্রিত প্রশ্ন সিলগালা করে রাখতে নতুন স্ট্রংরুম তৈরি করা হয়েছে- সব ছাপা প্রশ্ন স্ট্রংরুমে রাখা হয়। বিজি প্রেসের মনিটরিং সেলের কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা সেলের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রশ্ন স্ট্রংরুমে সিলগালা করা হয়। মূল গেট বন্ধের পর সেখানে সার্বক্ষণিক পুলিশী নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরো বিজি প্রেস সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে গোপনীয় শাখার কার্যক্রম বিশেষভাবে মনিটর করা হচ্ছে। এ শাখার কর্মকর্তাদের পুরো শরীর তল্লাশী করে ঢুকতে দেওয়া হয় এবং বের হওয়ার পর দ্বিতীয় দফায় পুরো শরীর পুনরায় তল্লাশী করা হয়। তাদের কোনো অন্তর্বাস ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না, পকেটহীন নীল রংয়ের পোশাক ব্যবহার করতে হয়, এবং ট্রাউজারে কোনো বেল্ট বা পকেট থাকে না।

- **কমিটি গঠন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা:** ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয় তদারকির জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।[৬৯] প্রশ্ন ফাঁসরোধ ও পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে।[৭০] তাছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ৬৪ জন কর্মকর্তাকে ৬৪ জেলায় শুধু পরীক্ষা পরিবীক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।[৭১]
- **মন্ত্রীর পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি:** ২০১৫ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সুষ্ঠু, নকলমুক্ত এবং ইতিবাচক পরিবেশে সম্পন্নের লক্ষ্যে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রশ্ন পরীক্ষার দিন কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর প্রায়ই স্মার্ট ফোনসহ আধুনিক ডিভাইসের মাধ্যমে ছবি তুলে ফেসবুকে প্রকাশ করার কারণে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করে এর প্রতিকার হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী প্রশ্ন ফাঁস করলে নামিদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছাড় পাবে না এবং ঐসব প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র, এমপিও এবং পরিচালনা কমিটি বাতিলসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন।[৭২]

৩.৯ উপসংহার

দেখা যায় সরকারি অংশীজন বিভিন্ন পন্থায় প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখছে ও বেসরকারি অংশের সুবিধাভোগীরা ফাঁসকৃত প্রশ্ন বিতরণ বা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে। তবে দেখা যাচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের কোনো না কোনো পর্যায়ের সম্পৃক্ততা ছাড়া প্রশ্ন ফাঁস সম্ভব নয়। সরকারি পর্যায়ের অংশীজনের মধ্যে নেপ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বিজি প্রেস, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং পরীক্ষা কেন্দ্র/ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ শিক্ষক এবং বেসরকারি পর্যায়ের অংশীজনের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নেতা-কর্মী, কোচিং সেন্টার, গাইড বই ব্যবসায়ী এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইমেইল ও ওয়েবসাইট লিংক অপারেটর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উল্লিখিত অংশীজন প্রশ্ন পাওয়ার পর তা ফটোকপির দোকান, শিক্ষার্থী ও বন্ধু বান্ধব ও অভিভাবকদের কাছে পৌঁছে দেয়। প্রশ্ন ফাঁসে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে (ইমেজ আকারে ইমেইল, ভাইবার, লিংক আদান-প্রদান) বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ধরনের (হাতে লেখা ও ছাপানো, উত্তরসহ ও উত্তরছাড়া) প্রশ্ন ফাঁস হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে এ বিষয়টি নিয়ে এক ধরনের বাণিজ্যিকীকরণ লক্ষ করা যায়। তবে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন ছাড়াই প্রশ্ন ফাঁস ও বিতরণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকার প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়।

আইনগতভাবে অনেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও যে মাত্রায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া যায় সে মাত্রায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন বিতরণের অভিযোগে শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকারী পর্যায়ে শাস্তির উদ্যোগ নিতে দেখা যায়, অথচ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের সংশ্লিষ্টদের কেউ এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিনা সে বিষয়টি তদন্তের উর্ধ্বে থেকে যায়। তবে প্রশ্ন প্রণয়নে পূর্বের তুলনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা ও কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রশ্নফাঁসে অভিযুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার উদাহরণ দেখা যায়।

---

[৬৯] 'প্রশ্নফাঁসে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে: শিক্ষামন্ত্রী', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ নভেম্বর ২০১৪।

[৭০] 'প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সনাতন পদ্ধতিতেই প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণ', *বাংলানিউজ২৪ডটকম*, (২১ নভেম্বর ২০১৪)।

[৭১] 'বেকায়দায় মন্ত্রী ফিজার', *দৈনিক ভোরের পাতা*, ৩০ নভেম্বর ২০১৪।

[৭২] 'প্রশ্নপত্রের কাঠামো পাল্টাচ্ছে', *দৈনিক যুগান্তর*, ১১ মে ২০১৫; 'প্রশ্নফাঁস করলে নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও ছাড় নয়', *বাংলানিউজ২৪ডটকম*, ১৩ মে ২০১৫।

প্রশ্ন ফাঁসের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষার গুণগত মানের চেয়ে পরিমাণগত মান বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এতে শিক্ষার্থীর যথাযথ মূল্যায়ন ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার গুণগত মান হ্রাসের অন্যতম কারণ হিসেবে প্রশ্ন ফাঁসের প্রবণতাকে দায়ী করা হচ্ছে সাধারণ ও পেশাজীবী গোষ্ঠীর একাংশ মনে করে প্রাথমিক সমাপনী থেকে এইচএসসি পর্যন্ত প্রতিটি সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ পরিক্ষার্থী ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পেয়ে যাচ্ছে এবং যে ১০ শতাংশ পরিক্ষার্থী ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পাচ্ছে না তারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত হয়ে যাচ্ছে।[৭৩] এই অধ্যায়ে প্রশ্ন ফাঁসের কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা হযেছে।

৪.১ প্রশ্ন ফাঁসের কারণ বিশ্লেষণ

৪.১.১ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে প্রশ্নফাঁসের বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রবণতা

তদন্ত কমিটি গঠন ও পরীক্ষা স্থগিত করে পরোক্ষভাবে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি স্বীকার করলেও প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টিকে অস্বীকার করা হয়। অনেক সময় ‘সাজেশন কমন পড়া’ আর ‘প্রশ্ন ফাঁস’ হওয়া এক নয় বলে যুক্তি দেখানো হয়। আবার ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষার বাংলা ১ম পত্রের ‘ক’ সেট নামে আট কপি প্রশ্ন ও হাতে লেখা উত্তরপত্র বিক্রির সময় পুলিশ উদ্ধার করলেও শিক্ষামন্ত্রী প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ নাকোচ করে দিয়ে ওই দিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘এটি গুজব’।[৭৪] এভাবে প্রশ্ন ফাঁস রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্তদের পদক্ষেপ গ্রহণে আন্তরিকতার ঘাটতি প্রশ্ন ফাঁসের মত বিষয়টিকে উৎসাহিত করে।

বক্স ৩: নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অস্বীকারের প্রবণতা

প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত ও শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে জানতে সংসদে শিক্ষামন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, “গত পাঁচ বছরে প্রশ্ন ফাঁস হয় নি”।

উৎস: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ জুন ২০১৪।

৪.১.২ আইনের প্রয়োগে শিথিলতা

ক. প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে পৃথক আইন না থাকলেও ‘পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) ১৯৮০ আইন’-এর ৪ ধারা অনুসারে ১০ বছরের শাস্তির বিধান ছিল। কিন্তু কোনো অংশীজনের দিক থেকে কোনো ধরনের দাবি বা চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও এ শাস্তি কমিয়ে চারবছর করে ১৯৯২ সালে আইন সংশোধন করা হয় [‘পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) ১৯৮০ (সংশোধন-১৯৯২) আইন’]। আবার বিদ্যমান আইনের আওতায়ও কোনো অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সংশোধনীর মাধ্যমে শাস্তির মাত্রা কমিয়ে আনায় প্রশ্ন ফাঁসে সম্পৃক্তদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ. প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সম্পৃক্ত কোচিং সেন্টার ব্যবসায়ীরা বিভিন্নভাবে নীতিমালার অস্পষ্টতার সুযোগ নিচ্ছে। ফলে কোচিং বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্তরা নিজেদের বাণিজ্যিক প্রসার এবং তথাকথিত সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এই প্রশ্ন ফাঁসকে ভিত্তি করে কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে।

বক্স ৪: শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উদ্বেগ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা) রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, ‘এসব ঘটনায় তদন্ত হয়। কিন্তু তদন্তের পর কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটা জনসমক্ষে জানানো হয় না। ফলে অপরাধীরা উৎসাহী হয়’।

সূত্র: ‘তদন্ত কমিটি করেই দায়িত্ব শেষ’, *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ এপ্রিল ২০১৪।

---

[৭৩] একজন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার, ২২ জানুয়ারি ২০১৫।

[৭৪] ‘বন্ধ হচ্ছে না প্রশ্ন ফাঁস’, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ এপ্রিল ২০১৪।

গ. নোট বই ও গাইড বই বন্ধে আইন থাকলেও তা যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না বলে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ হচ্ছে না। দেখা যায়, বছরের শুরুতে সরকারের পক্ষ থেকে নোট বই ও গাইড বই নিরোধ অভিযান চালানো হয় ও সাময়িক শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু আইনের বাস্তবায়নে কার্যকর কোন উদ্যোগ দেখা যায় না, এতে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত নোট বই বা গাইড বই ব্যবসায়ীরা প্রশ্ন ফাঁসের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে।[৭৫]

৪.১.৩ অত্যধিক ধাপ, দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও অধিক সংখ্যক ব্যক্তির সম্পৃক্ততা

প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণে প্রায় ৪০টি ধাপ বিদ্যমান যা একদিকে সময়সাপেক্ষ, এবং অন্যদিকে পুরো প্রক্রিয়ার সাথে অনেক বেশি সংখ্যক ব্যক্তির সম্পৃক্ততা থাকায় প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকিও বেশি থাকে। ফলে প্রশ্ন ছাপানো, প্যাকেটজাত করা, ট্রাংকজাত করা, জেলা-উপজেলা ও কেন্দ্র পর্যায়ে প্রশ্ন পৌঁছানোর মত বিরাজমান দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়।

৪.১.৪ তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না করা

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এখন পর্যন্ত একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু কোনটির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি। ফলে কারা অভিযুক্ত বা কোন প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন ফাঁস হয় সে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায়। ফলে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সম্পৃক্তরা শাস্তির বাইরে থেকে যায় ও প্রশ্ন ফাঁসের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে।[৭৬]

৪.১.৫ একই শিক্ষকের প্রতিবছর প্রশ্ন প্রণেতা হিসেবে নিয়োগ

বর্তমানে দশটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র প্রণেতা ও মডারেটর নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো গাইডলাইন না থাকায় প্রশ্নপত্র প্রণেতা ও মডারেটরদের সক্ষমতা ও যোগ্যতার বিষয়টি গুরুত্ব না পাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়, এবং একই শিক্ষক প্রতিবছরই প্রশ্ন প্রণেতা ও মডারেশনকারী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।[৭৭] তাছাড়া সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই বলে প্রথা অনুযায়ী একজন শিক্ষক দু'টি বোর্ডের বেশি মডারেট করতে পারেন না, অথচ বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশই দুই-এর অধিক বোর্ডের মডারেশনের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। বিষয়টি জানারও সুযোগ নেই কারণ এমন কেউ নেই যিনি পুরো বিষয়টিকে সমন্বয় করবেন।[৭৮] এই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে এসব শিক্ষকের একাংশ নিজ নিজ স্কুল ও কোচিং সেন্টারে সাজেশন হিসেবে প্রশ্ন দেওয়ার মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসে সম্পৃক্ত থাকেন।

৪.১.৬ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর তদারকির ঘাটতি

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইমেইল, ওয়েবসাইট ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রশ্ন ছড়ানোর ওপর সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘাটতির সুযোগ নিয়ে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সম্পৃক্তরা অনৈতিক কার্যক্রমটি চালিয়ে যাচ্ছে

৪.১.৭ নতুনভাবে প্রবর্তিত পরীক্ষা কাঠামোর ওপর যথাযথ প্রশিক্ষণের ঘাটতি

বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ও যথাযথ প্রস্তুতির ঘাটতি প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতা বাড়ানোর উদ্যোগটি সময়ের দাবি বলে পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশের অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ। কিন্তু নতুন এ বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকার কারণে ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহ করার দিকে তাদের মনোযোগ বেশি থাকতে দেখা যায়। এতে অধিক নম্বর পেয়ে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাশ করতে পারছে।

৪.১.৭ পর্যাপ্ত তদারকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া

বিজি প্রেসে জনবলের ঘাটতি নিয়েই নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে আরও দু'টি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নের দায়িত্ব। একদিকে জনবলের ঘাটতি ও অন্যদিকে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় যথাযথ তদারকি ও সমন্বয়ে ঘাটতি তৈরি হয়। এ সুযোগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর একাংশের প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

---

[৭৫] সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার, ২১ জুলাই ২০১৫।

[৭৬] শিক্ষাবিদের সাক্ষাৎকার, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫; সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার, ২২ জানুয়ারি ২০১৫; অভিভাবক ফোরামের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার, ২৮ জানুয়ারি ২০১৫।

[৭৭] 'No Guidelines for SSC, HSC question-setters, moderators: Random selection creating scope for question leaks', *New Age*, April 13, 2014.

[৭৮] একজন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার, ৩০ জুলাই ২০১৫।

৪.১.৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, পাশের হার, জিপিএ-৫ সহ পাঁচটি সূচকের বিবেচনায় 'জাতীয় পর্যায়ে সেরা ২০' বা 'জেলা পর্যায়ে সেরা ১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে তালিকা প্রকাশের পদ্ধতি চালু করার পর থেকে প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকিও বেড়েছে বলে অনেকে মনে করেন।[৭৯] এমনকি বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রীও মনে করেন সৎ উদ্দেশ্যে এ পদ্ধতি চালু করা হলেও তালিকায় ওপরের দিকে থাকার জন্য কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অস্বাভাবিক, অনৈতিক ও অসৎ পথ অবলম্বন করছে যেখানে প্রশ্ন ফাঁস অন্যতম।[৮০] 'এ' গ্রেডভুক্ত হওয়া, এমপিওভুক্ত হওয়া ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে র‍্যাংকিং ওপরের দিকে রেখে 'তথাকথিত সুনাম বৃদ্ধির' মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশ্ন ফাঁসে সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া যায়। এজন্য কেন্দ্রে প্রশ্ন পৌঁছানোর সাথে সাথে প্যাকেট খুলে ছবি তুলে উত্তর তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বলে দেওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়। উল্লেখ্য সরকারিভাবে সেরা বিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নের বিষয়টি এ বছর থেকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

৪.১.৯ বিকল্প প্রশ্ন না থাকায় ফাঁস করা সহজতর হওয়া
পিইসিই পরীক্ষায় বিকল্প প্রশ্ন না থাকায় ও সময়ের স্বল্পতার কারণে ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ২০১৪ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার জন্য একটি মাত্র সেট তৈরি করার ফলে ফাঁস হওয়ার বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়ার পরও বিকল্প না থাকায় ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

৪.১.১০ ম্যানুয়ালি গণনা করায় ঝুঁকি সৃষ্টি
বিজি প্রেসে প্যাকেটজাত করার কাজটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে হয় না বলে হাতে গণনা করার সময় প্রশ্ন দেখে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা প্রশ্ন ফাঁসে সহায়ক।

৪.১.১১ প্রশ্ন ফাঁসের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সচেতনতার ঘাটতি
প্রশ্ন ফাঁসের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব এবং পরীক্ষায় সন্তানের তাৎক্ষণিক সাফল্যকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টিকে তরান্বিত করছে। আবার, অনেক সময় ফাঁসকৃত প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা থাকলেও সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে ফাঁসের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেতে দেখা যায়।

৪.২ প্রশ্ন ফাঁসের ফলাফল

৪.২.১ বিভিন্ন অংশীজনের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি
প্রথমত, কোচিং সেন্টারে প্রশ্ন সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বিষয়ে অবগত করা হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন গাইড বইয়ের কাটতি বাড়ছে অন্যদিকে শিক্ষার্থীরাও সীমাবদ্ধতাটি কাটিয়ে উঠার পন্থা হিসেবে অনৈতিকভাবে ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহ করার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সার্বিকভাবে সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণার ঘাটতির কারণে গাইডবইয়ের ব্যবসায় সম্পৃক্তদের সাথে সৃজনশীল অংশের প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের মধ্যে যোগসাজশ পরিলক্ষিত হয় এবং আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, নিয়মানুযায়ী প্রশ্ন তৈরি বা মডারেট করার সময় ব্যাগ, মোবাইল বা কোন প্যাকেট সাথে থাকার কথা না। কিন্তু দেখা যায় ব্যাগে করে কপি নিয়ে এসে ছাপানোর জন্য বিভিন্ন সেট নির্ধারিত হওয়ার পর বাকি প্রশ্ন সেটের কপি বোর্ড ও বিজি প্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে বা নষ্ট করার করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা হয় না। ফলে এসব প্রশ্নের কপি বিজি প্রেসে প্রশ্ন ছাপানোর সাথে জড়িত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে থেকে যায় এবং এ সূত্র থেকেও ভুয়া প্রশ্ন ছড়ানোর তথ্য পাওয়া যায়।[৮১] সার্বিকভাবে বলা যায়, পরীক্ষাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে এক ধরনের বাণিজ্যিক মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রবণতা থাকে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জায়গায় সঠিক প্রশ্ন না পেয়ে বা ভুয়া প্রশ্নের জন্য ভুল জায়গায় অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে হয়রানির শিকার হয় এবং সঠিক প্রশ্ন পেতে কৌশল হিসেবে বহু উৎস থেকে একাধিক পরীক্ষার প্রশ্ন পেতে চেষ্টা করে। এখানেও বারবার প্রতারিত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। একদিকে আসল প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে ও অন্যদিকে প্রশ্ন ফাঁসের প্রপঞ্চকে কাজে লাগিয়ে ভুয়া প্রশ্ন দিয়ে সম্পৃক্তদের বাণিজ্য করতে দেখা যায়। এ বাণিজ্যের সুবিধাভোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় এর প্রসারও দ্রুত ঘটতে দেখা যায়। এখানে প্রত্যাশাও বড় এবং বাজারটাও বড়।[৮২]

---

[৭৯] *শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে: এসএসসি পরীক্ষার ফল*, দৈনিক প্রথম আলো, ১ জুন ২০১৫।
[৮০] *সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা থাকবে না: শিক্ষামন্ত্রী*, দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ মে ২০১৫।
[৮১] একজন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার, ৩০ জুলাই ২০১৫।
[৮২] একজন শিক্ষাবিদের সাক্ষাৎকার, ২৩ মার্চ ২০১৫।

৪.২.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশ্ন কেনার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রতিষ্ঠানের 'তথাকথিত সুনাম' ও পাশের হার বৃদ্ধির জন্য প্রশ্ন পেতে সমষ্টিক প্রয়াস চালায়। এর অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন কেনার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করার উদাহরণ রয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন কেনা বাবদ কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ আদায় করার তথ্য পাওয়া যায়।[৮৩]

৪.২.৩ কোচিং সেন্টারে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্ররোচিত করা
শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে স্কুলে ক্লাসের গুরুত্ব কমিয়ে কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা দীর্ঘদিনের। এ সুযোগে কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষার নামে ব্যবসার সুযোগ নিচ্ছে। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, কোচিং ব্যবসার সাথে স্কুলের শিক্ষকরাও জড়িত থাকেন। আবার কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত অনেক শিক্ষক পরীক্ষার প্রশ্ন করা থেকে শুরু করে পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা দায়িত্বে থাকেন। ফলে তাদের একাংশের মধ্যে ক্লাসে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে কোচিং-এ ঠেলে দেওয়ার মানসিকতা দেখা যায়। আবার ফাঁসকৃত প্রশ্ন সরবরাহ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কোচিং কেন্দ্রিক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।[৮৪] শিক্ষকদের নিজেদের তৈরি বিভিন্ন কপি করা শিট বিক্রি করেও ব্যবসা করতে দেখা যায়। ফলস্বরূপ, 'সর্বাধিক কমন পড়ার বা সাজেশন' পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টার নির্বাচন করে - অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা এ ধরনের বাস্তবতা ও প্রচারণার মাধ্যমে আকৃষ্ট হয় ও প্রশ্ন ফাঁস অব্যাহত থাকে।

৪.২.৪ পঠন ও পাঠনের পরিবর্তে ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহে শিক্ষকদের অধিক মনোযোগ
গবেষণায় দেখা যায়, কোনো কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার কথা ভেবে পাঠদানের চেয়ে প্রশ্ন সংগ্রহ করার চেষ্টায় অধিকতর মনোযোগী থাকেন। অনেক সময় একদিকে নতুন নতুন পাঠ্যক্রম ও ধরন পরিবর্তন ও অন্যদিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব- শিক্ষকদের পাঠদানে আগ্রহী না করে বরং প্রশ্ন সংগ্রহ ও শিক্ষার্থীদের হাতে প্রশ্ন সংগ্রহ করে তুলে দেওয়ার দিকে ধাবিত করতে দেখা যায় বেশি। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের 'তথাকথিত সুনাম' বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে।

৪.২.৫ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি
প্রশ্ন ফাঁসের কারণে শিক্ষার্থীরা অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তারা পিছিয়ে পড়ছে। প্রশ্ন ফাঁসের সুবিধা নিয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম মেধাবী শিক্ষার্থীরা অধিক সুযোগ নিচ্ছে। ফলে উৎপাদনমুখী ও সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়া ও কম পরিশ্রমে ভাল ফলাফল করার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। এমনকি সুষ্ঠু পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

৪.২.৬ পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িতদের ওপর অতিরিক্ত পেশাগত চাপ বৃদ্ধি
প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও পাঠদানের সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে এক ধরনের শংকা কাজ করছে। অনেক ক্ষেত্রে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পেশাগত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার পরেও প্রশ্ন ফাঁসের কারণে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয় যা অতিরিক্ত মানসিক চাপ তৈরি করছে।

৪.৩ প্রশ্ন ফাঁসের প্রভাব

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নকল বা শিক্ষকদের উত্তর বলে দেওয়ার বিষয়গুলো আগেও ছিল কিন্তু এখন এর ব্যাপকতা বেড়েছে প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে এবং সাম্প্রতিক সময়ে বিষয়টি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।[৮৫]

৪.৩.১ নৈতিকতার অবক্ষয়
প্রশ্ন ফাঁসের ফলে নানাভাবে শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত হচ্ছে। এতে দেশ ও নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা নানারকম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষকরে একটি নীতিহীন সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে এরা বেড়ে উঠছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে কোনো ধরনের 'অপরাধবোধ' কাজ না করা ও প্রশ্ন সংগ্রহ করার বিষয়টিকে 'সাফল্য' হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ তারা এটাতেই অভ্যস্ত

[৮৩] শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।
[৮৪] 'প্রশ্নফাঁস রোধে কঠোর শাস্তি চান শিক্ষাবিদরা', *দৈনিক সমকাল*, ১২ জুন ২০১৪।
[৮৫] বিভিন্ন সময়ে একাধিক বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, অভিভাবকদের সাথে সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য।

হয়ে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বিষয়টি নীতি বিবর্জিত প্রজন্ম উপহার দেওয়ার মত বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলে তথ্যদাতারা মনে করেন। অন্যদিকে ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার অভিযোগ সাপেক্ষে প্রমাণ থাকলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ঘাটতি প্রশ্ন ফাঁসকারীদের আরও উৎসাহিত করছে। ফলে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সব ধরনের সুবিধাভোগী ও অংশীজন থেকে প্রশ্ন পাওয়া, অন্যকে বিতরণ ও সর্বোপরি পুরো বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে নেওয়ার মত সহনশীল মানসিকতা লক্ষণীয়।

৪.৩.২ শিক্ষার মানের অবনতি

প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সার্বিকভাবে শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্টরা। এতে অদূর অবিষ্যতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতার ঘাটতিসহ দেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছেন তথ্যদাতারা। এভাবে পাশ করে যাওয়ার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ততার ফলস্বরূপ পরবর্তীতে এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিয়োগ নিয়ে নীতিনির্ধারকদের ভূমিকা পালন করবে। নতুন প্রজন্ম এমন একটি পরিবেশের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছে যেখানে প্রকৃত ও সুশিক্ষিত প্রজন্ম হতে দেশ বঞ্চিত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের কারণ, ফলাফল ও প্রভাব চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

চিত্র ৯: প্রশ্ন ফাঁসের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

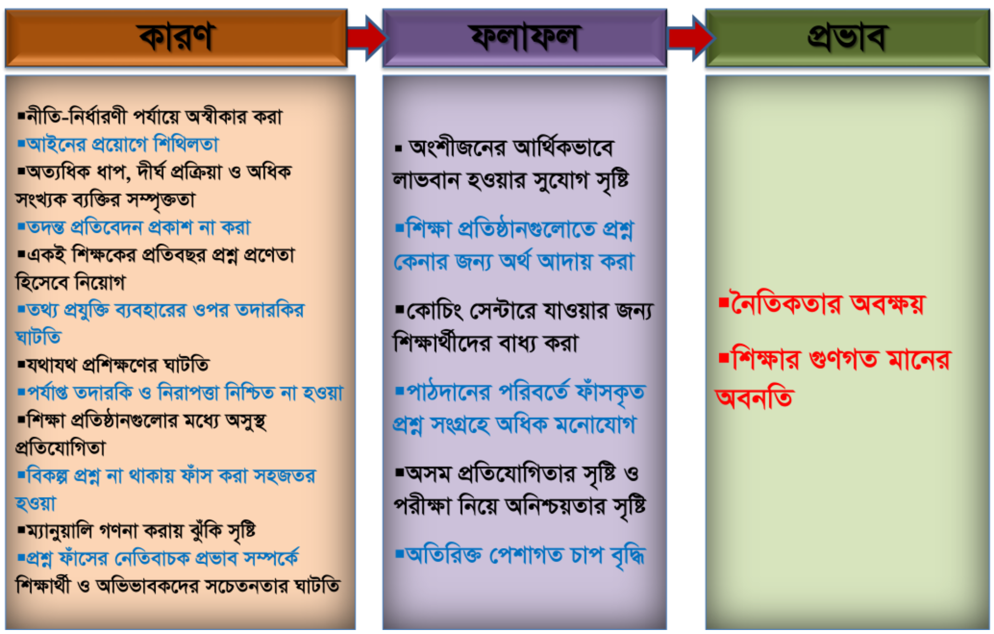

৪.৪ উপসংহার

সার্বিকভাবে বলা যায়, প্রশ্ন ফাঁস রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্তদের 'সাজেশন কমন পড়া' আর 'প্রশ্ন ফাঁস' হওয়া এক নয় বলে যুক্তি দেখিয়ে প্রশ্ন ফাঁসের মত বিষয়টিকে অস্বীকার করা, আইনের শাসনের অভাব ও তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না করায় সম্পৃক্তদের উৎসাহ বৃদ্ধি, অত্যধিক ধাপে প্রশ্ন প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং একই শিক্ষক কর্তৃক প্রশ্ন প্রণয়ন করানোর মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ প্রদান, এবং পর্যাপ্ত তদারকি ও পরিবীক্ষণের ঘাটতির কারণে প্রশ্ন ফাঁস অব্যাহত রয়েছে।

প্রশ্ন ফাঁসের ফলে সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণার ঘাটতির কারণে গাইডবইয়ের ব্যবসায় সম্পৃক্তদের সাথে সৃজনশীল অংশের প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের মধ্যে যোগসাজশ পরিলক্ষিত হয় এবং আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। একদিকে আসল প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে ও অন্যদিকে প্রশ্ন ফাঁসের প্রপঞ্চকে কাজে লাগিয়ে ভুয়া প্রশ্ন দিয়ে সম্পৃক্তদের বাণিজ্য করার তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া শিক্ষক কর্তৃক পাঠদানের পরিবর্তে ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহ করা ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা এবং শিক্ষার্থীদের কোচিং-এ যাওয়ার জন্য বাধ্য করার প্রবণতা দেখা যায়। সর্বোপরি, পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষার বিষয়ে অসম প্রতিযোগিতা ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের মধ্যে পেশাগত চাপ বৃদ্ধির তথ্য পাওয়া যায়।

চূড়ান্তভাবে, প্রশ্ন ফাঁস সংশ্লিষ্ট অংশীজন বিশেষকরে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার অবক্ষয় ও শিক্ষার মানের অবনতির দিকেই দেশ ও জাতিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে তথ্যদাতারা মনে করছেন।

অধ্যায় পাঁচ

উপসংহার ও সুপারিশ

সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি স্বাধীন জাতির সার্থকতা অর্জনের একমাত্র পথ শিক্ষা। এ কার্যক্রমকে সম্প্রসারণের অন্যতম উপাদান হল পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা, যেখানে একাধিক সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত অংশীজন রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বিজি প্রেস, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত।

গবেষণার উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে দেখা যায় প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণের সাথে যেসব সরকারি অংশীজন জড়িত তাদের একাংশ কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত, যদিও নির্দিষ্ট কোনো একটি প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে দায়ী করা যায় না। আবার ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর সাথে জড়িত থাকে বেসরকারি পর্যায়ের একাধিক অংশীজন। প্রশ্ন প্রণয়নের প্রক্রিয়া দীর্ঘ, সময়সাপেক্ষ, ম্যানুয়াল, এবং এর সাথে অনেক ব্যক্তির সম্পৃক্ততা প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। দেখা যায় প্রশ্ন তৈরি, ছাপানো ও বিতরণের তিনটি পর্যায়ের প্রায় ১৮টি ধাপে প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি বিদ্যমান।

প্রশ্ন ফাঁসে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে (ইমেজ আকারে-ইমেইল, ভাইভার, লিংক আদান-প্রদান) বিভিন্ন সময়ে (তিন থেকে চারদিন আগে থেকে পরীক্ষা শুরুর আগ পর্যন্ত) ও বিভিন্ন ধরনের (হাতে লিখা ও ছাপানো, উত্তরসহ ও উত্তরছাড়া) প্রশ্ন ফাঁস হতে দেখা যায়। ফাঁসকৃত প্রশ্ন আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ছড়ায়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন ছাড়াই প্রশ্ন ফাঁস ও বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত থাকার প্রবণতাও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। সর্বোপরি এ বিষয়টি নিয়ে এক ধরনের বাণিজ্যিক প্রবণতার উদ্ভবও লক্ষ করা যায়।

এ গবেষণায় পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নে অনেক অংশীজনের জড়িত থাকা, অত্যধিক ধাপ ও সময়সাপেক্ষতা এবং জনবলের ঘাটতির ফলে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু তদারকি ব্যাহত হওয়ার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহ ও ছড়ানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করার পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক সমন্বিত প্রয়াস চালানোর প্রবণতা দেখা যায়। শাস্তিমূলক আইনের প্রয়োগে শিথিলতা, নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অস্বীকার করা ছাড়াও প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণে তদারকি ও সমন্বয়ের ঘাটতি প্রভৃতি প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টিকে উৎসাহিত করছে। তাছাড়া প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত অভিযোগের তুলনায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত অপ্রতুল, যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্ন ফাঁস রোধে সরকারের দিক থেকে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়।

প্রশ্ন ফাঁসের ফলে সার্বিকভাবে লক্ষণীয় হল এ সুযোগে একটি গোষ্ঠী আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। যারা প্রশ্ন পেয়ে পাশ করে তাদের উদ্ভাবনী শক্তি বা সৃজনশীলতা তৈরি না হওয়া এবং গুণগত মানের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে নিজস্ব মেধার ব্যবহার করার সক্ষমতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা ব্যাহত হচ্ছে। সর্বোপরি নীতি-বিবর্জিত একটি প্রজন্ম গড়ে ওঠার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের সদিচ্ছাই এ সমস্যা থেকে জাতিকে পরিত্রাণ যোগাতে পারবে বলে তথ্যদাতাদের অভিমত।

৫.১ সুপারিশ

গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে যা প্রশ্ন ফাঁসের সমাধানে সরকারের সহায়ক হিসেবে অবদান রাখতে পারে:

১. প্রশ্ন ফাঁস রোধে সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে:
   - ‘পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২’ এর ৪ ধারা পুনরায় সংশোধন করে শাস্তির মাত্রা পূর্বের ধারা অনুযায়ী পুনর্বহাল করতে হবে এবং নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
   - কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধকরণে সরকারের ‘শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ এর অস্পষ্টতা দূর করতে হবে এবং কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন প্রণোদনাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

- প্রশ্ন ফাঁস রোধ ও সৃজনশীল পদ্ধতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গাইডবইয়ের আদলে প্রকাশিত সহায়ক গ্রন্থাবলী বন্ধে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর তদারকি বাড়াতে হবে ও প্রচলিত আইনের অধীনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

৩. ধাপ কমাতে প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণের কাজটি পরীক্ষামূলকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে এবং পরবর্তীতে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

৪. প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে গঠিত যেকোনো তদন্ত প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনাগত যেকোনো পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৬. প্রশ্ন ফাঁস রোধে বহুনির্বাচনী প্রশ্নব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে তুলে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. পিইসিই পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট রাখতে হবে।

তথ্যসূত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী)।

পরিকল্পনা কমিশন, *ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)*, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১২।

পরিকল্পনা কমিশন, *জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১)*, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মে ২০১৩।

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, *সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১২।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার (২০১৪)*।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৩, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১ মার্চ ২০১৫, পরিপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ২০১৪, *মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৫ ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৫*, ঢাকা।

Planning Commission, *Perspective Plan of Bangladesh (2010-2021): Making Vision 2021 A Reality*, General Economics Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, April 2012.

United Nations, *The Millenium Development Goals Report (2015).*

পরিশিষ্ট ১: প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগের কিছু ঘটনা

বছর	পরীক্ষা	বিষয়	উৎস
২০১২	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসিই) (১)	*	দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর, ২০১৪
২০১৩	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসিই) (৬)	ইংরেজি, বাংলা, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল ১১, ২০১৪; দৈনিক যায়যায়দিন, ২২ নভেম্বর, ২০১৩; দৈনিক প্রথম আলো, ২১ নভেম্বর, ২০১৩
২০১৩	জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি) (২০)	বাংলা ১ম ও ২য় পত্র, ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র, গণিত/সাধারণ গণিত, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/ইসলাম শিক্ষা, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/হিন্দুধর্ম শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/খিস্টধর্ম শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি,কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, আরবি, পালি, সংস্কৃত, চারু ও কারুকলা, বিজ্ঞান/সাধারণ বিজ্ঞান, শরীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়	দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল ১১, ২০১৪; দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৭ জুন, ২০১৪; দৈনিক ইনকিলাব, নভেম্বর ২৩, ২০১৩
২০১৪	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসিই) (৬)	ইংরেজি, বাংলা, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৪
২০১৪	জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি) (২০)	বাংলা ১ম ও ২য় পত্র, ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র, গণিত/সাধারণ গণিত, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/ইসলাম শিক্ষা, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/হিন্দুধর্ম শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/খিস্টধর্ম শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি,কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, আরবি, পালি, সংস্কৃত, চারু ও কারুকলা, বিজ্ঞান/সাধারণ বিজ্ঞান, শরীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়	বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৪
২০১৪	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এসএসসি) (৭)	এসএসসি পরীক্ষার বাংলা ১ম পত্র ও ২য় পত্র, ইংরেজি ১ম পত্র ও ২য় পত্র, গণিত, পদার্থ ও রসায়ন পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া যায়।	বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৩০ ডিসেম্বর; ২০১৪ দৈনিক যুগান্তর, ১১ এপ্রিল ২০১৪; দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল ১১, ২০১৪
২০১৪	উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এইচএসসি) (১)	ইংরেজি ২য় পত্র	দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল ১১, ২০১৪; পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস, দৈনিক যুগান্তর, এপ্রিল ১১, ২০১৪, দৈনিক মানবজমিন, ২৫ এপ্রিল, ২০১৪
২০১৫	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এসএসসি) (১)	গনিত	বিবিসি বাংলা, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
২০১৫	উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এইচএসসি) (১)	হিসাব বিজ্ঞান ২য় পত্র	বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম ১৮ মে ২০১৫

*ঐ বছর কতগুলো পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য না পাওয়ায় ন্যূনতম একটি ঘটনা গণ্য করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট ২: প্রশ্ন ফাঁসের একটি নমুনা

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, ২০১৪

বাংলা

সময়—২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান—১০০

[**দ্রষ্টব্যঃ**—ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

নম্বর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে **১, ২, ৩, ৪ ও ৫** নম্বর ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ ঃ

জয়নুল আবেদিন ২৯ শে ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন চুপচাপ ধরনের। চারপাশের সবকিছু মনোযোগ দিয়ে দেখতেন। মানুষ, পশু-পাখি ও প্রকৃতির খুব ছোট ছোট বিষয়ও তাঁর নজর কাড়তো। এই দেখা থেকেই তাঁর ছবি আঁকার শখ হয়। জয়নুলের কলকাতা আর্ট স্কুলে পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তাঁর বাবার সেই আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। জয়নুলের আগ্রহ দেখে তাঁর মা পড়ার খরচ দিতে চাইলেন। জয়নুলের মা নিজের গলার সোনার হার বিক্রি করলেন। সেই টাকা দিয়ে জয়নুল কলকাতার আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে আর্ট কলেজে পড়ে তিনি খুব ভালো ফলাফল করেন। তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন। ১৯৩৮ সালে জাতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে ছয়টি জল রং ছবির জন্য তিনি পেয়েছেন সম্মানজনক পুরস্কার 'গভর্নরের স্বর্ণপদক'। সেই সময় এই পদক ছিল শিল্পীদের জন্য বিরল সম্মানের ব্যাপার। কয়েকটি ঘটনাকে বিষয় করে আঁকা তাঁর ছবি পৃথিবীর শিল্পরসিকদের মুগ্ধ করেছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবি হলো—'দুর্ভিক্ষ', 'বিদ্রোহী', 'মা', 'ঝড়', 'গুণটানা', 'সাঁওতাল রমণী' ইত্যাদি। তিনি ঢাকায় 'নর্মাল স্কুল'-এ আর্টের শিক্ষক ছিলেন। পরে ১৯৪৮ সালে শিল্পাচার্য জয়নুলই প্রতিষ্ঠা করেন 'ঢাকা আর্ট কলেজ'। বর্তমানে এর নাম 'চারুকলা ইনস্টিটিউট'। ১৯৭৬ সালের ২৮শে মে তিনি মারা যান। কবি নজরুলের সমাধির পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে।

১। সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ ঃ ১×৫=৫

(১) পাঠটিতে কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?

(ক) রফিকুন নবী (খ) মোস্তফা আনোয়ার

(গ) জয়নুল আবেদিন (ঘ) কামরুল হাসান

(২) জয়নুল আবেদিন বিখ্যাত হয়েছেন—

(ক) ছবি আঁকার জন্য (খ) গান গাওয়ার জন্য

(খ) খেলাধুলা করার জন্য (ঘ) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য

(৩) কিশোরগঞ্জ শব্দে 'ঞ্জ' যুক্ত বর্ণটিতে নিচের কোন বর্ণগুলো রয়েছে?

(ক) জ + ঞ (খ) ন + ঞ

(গ) ঞ + জ (ঘ) ঞ + ন

(৪) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন চারুকলা অনুষদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেন?

(ক) ছবি বিক্রি করার জন্য (খ) ছবির প্রদর্শনী করার জন্য

(গ) নিজে বিখ্যাত হওয়ার জন্য (ঘ) অন্যদের ছবি আঁকা শেখার সুযোগ দেয়ার জন্য

(৫) কোন বাক্যটিতে সঠিক বিরাম চিহ্নের ব্যবহার হয়েছে?

(ক) ছবি আঁকলে মীনার মন ভাল হয়, (খ) তুমি কি বাইরে বেড়াতে যাবে?

(গ) ছোটবেলায় তিনি অসুস্থ থাকতেনঃ (ঘ) পিঠা খেতে খুব ভাল লাগে!

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পরিশিষ্ট ৩: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের কয়েকটি নমুনা

ইমেইল

Date: Mon, 24 Nov 2014 22:36:47 +0600
From: [redacted]@gmail.com>
To: [redacted]
Subject: Re: PSC Bangladesh & ....
শূন্যস্থান পূরন :
পৃঃ ১২ - খ
পৃঃ ২১ - ২ প্রশ্ন ক
পৃঃ ৪৬ - ২ প্রশ্ন খ
পৃঃ ৫৪ - ২ প্রশ্ন খ
পৃঃ ৭৭ - ২ প্রশ্ন চ
পৃঃ ৮২ - ২ প্রশ্ন গ
পৃঃ ৯৪ - ২ প্রশ্ন খ, ঘ
পৃঃ ১০৩ - ২ প্রশ্ন খ , ঘ
সঠিক উত্তর:
পৃঃ ২১ - ১.১
পৃঃ ৩২ - ১.৪
পৃঃ ৬৩ - ১.৪
পৃঃ ৭৭ - ১.১ , ১.৫
পৃঃ ৮১ - ১.১
পৃঃ ৮৬ - ১.২ , ১.৪
পৃঃ ১০২ - ১.১
পৃঃ ১০৩ - ১.২
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:
পৃঃ ১৩ - ক , খ
পৃঃ ২২ - ক ,গ
পৃঃ ৪৭ - ক
পৃঃ ৫৫ - ঘ
পৃঃ ৬৪ - ক
পৃঃ ৭০ - ক , খ
পৃঃ ৭৮ - খ
পৃঃ ৯৪ – গ
পৃঃ ১৩- ৪ প্রশ্ন ঘ
পৃঃ ৩৩- ৫ প্রশ্ন গ
পৃঃ ৪৭- ৪ প্রশ্ন ক "কুটির শিল্প কি?
পৃঃ ৫৫-৪ প্রশ্ন ক, খ,ঙ
পৃঃ ৬৪- ৪ প্রশ্ন ঙ
পৃঃ ৭০- ৪ প্রশ্ন ক, ঙ
পৃঃ ৭৮- ৪ প্রশ্ন খ
পৃঃ ৮৭- ৪ প্রশ্ন ক
পৃঃ ৯৪- ৪ প্রশ্ন ঙ
পৃঃ ১১১-" সার্ক কি?
পৃঃ ১১৪- ৪ প্রশ্ন খ
রচনামূলক প্রশ্ন :
ক . মনে করো গত সপ্তাহে তুমি বাংলাদেশের ১টি ঐতিহাসিক স্থানে পরিদর্শন করেছো – এ সম্পর্কে ৫টি বাক্যলিখ।
খ . বুদ্ধিজীবি কারা ? বুদ্ধিজিবি হত্যার ২টি কারন লিখ । দাশের হত্যার ২টি ফলাফল লিখ ।
গ . নিরাপদ পানি কাকে বলে ? নিরাপদ পানি পান করা প্রয়োজন কেন ? নিরাপদ পানি পান করার ৩টি উপায় লিখ ।
[] টিকা . মুজিব নগর সরকার শপথ নিয়েছিল কবে ? মুজিব নগর সরকারের রাষ্টপতি কে ?
প্রশ্নঃ (এগুলো দেখে নাও)
১. মুজিবনগর সরকার কখন ও কথায় গঠিত হয়েছিল? এ সরকার এ কারা ছিলেন?**
২. কাদের নিয়ে মুক্তি বাহিনীই গঠিত হয়েছিল? ***
৩. পলাশি যুদ্ধ কেন হয়েছিল? এই যুদ্ধের ফলাফল কি?***
৪. সার্ক ও জাতিসংঘের উদ্দেশ এর পার্থক্য লিখ।***
৫.ত্রিপুরাদের উৎসবের বর্ণনা দাও।
sir ata psc er bangladesh & bissso porichiti er question er ager question tou fhas hoicilo
৬. গনতান্ত্রিক মনোভাব কাকে বলে?
34 minutes ago · Sent from Mobile
[redacted]
বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি
পৃষ্ঠাঃ১৩- ৪ প্রশ্ন ঘ পৃষ্ঠাঃ৩৩- ৫ প্রশ্ন গ
পৃষ্ঠাঃ৪৭- ৪ প্রশ্ন ক "
কুটির শিল্প কি? পৃষ্ঠাঃ৫৫-৪ প্রশ্ন ক, খ, ঙ
পৃষ্ঠাঃ৬৪- ৪ প্রশ্ন ঙ পৃষ্ঠাঃ৭০- ৪ প্রশ্ন ক, ঙ
পৃষ্ঠাঃ৭৮- ৪ প্রশ্ন খ পৃষ্ঠাঃ৮৭- ৪ প্রশ্ন ক
পৃষ্ঠাঃ৯৪- ৪ প্রশ্ন ঙ পৃষ্ঠাঃ১১১-" সার্ক কি?
পৃষ্ঠাঃ১১৪- ৪ প্রশ্ন খ
১. মুজিবনগর সরকার কখন ও কথায় গঠিত হয়েছিল? এ সরকার এ কারা ছিলেন?**
২. কাদের নিয়ে মুক্তি বাহিনীই গঠিত হয়েছিল? ***
৩. পলাশি যুদ্ধ কেন হয়েছিল? এই যুদ্ধের ফলাফল কি?***
৪. সার্ক ও জাতিসংঘের উদ্দেশ এর পার্থক্য লিখ। ***
৫.ত্রিপুরাদের উৎসবের বর্ণনা দাও।
৬. গনতান্ত্রিক মনোভাব কাকে বলে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

ওয়েবসাইটের লিংক

hackwot96@ovi.com

ADD ME Offer UnlimitedFriend লাইক দিন বন্ধু বাড়ান। over a month ago
Government official - 21,074 Likes
এইচএসসি পরিক্ষার্থী মামারা কার কোন বোর্ড এর সাজেশন লাগবে– তারা এই পেজ এ একটা লাইক দিয়ে বোর্ড এর নাম chik in করুন। √√R Psc \\ Jsc \\ Ssc \\ Hsc • → All Exam Short সাজেশন R√√ ৫মিনিট এর মধ্যে আপনার Inbox এ আমরা পাটিয়ে দেব।

ADD ME Offer UnlimitedFriend লাইক দিন বন্ধু বাড়ান। over a month ago
Government official - 21,074 Likes
মামারা এইচএসসি বাংলা ১ম পত্র সাজেশন – ২০১৫ দেওয়া হল।যাদের দেখার ইচ্ছুক নিচের পেজ এ দেখে আসুন।আর মাএ একটি লাইক দিবেন √√R Psc \\ Jsc \\ Ssc \\ Hsc • → All Exam Short সাজেশন R√√

উত্তরসহ কেন্দ্র হতে সরবরাহ